তীর্থদর্শন।

(দ্বিতীয় অংশ।)

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

শ্রীহরিচরণ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত।
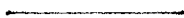
কলিকাতা।

৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট্;

রামনারায়ণযন্ত্রে শ্রীকালীপ্রসন্ন বসু দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

শক ১৮১৩।

সূচিপত্র।
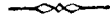
ভূমিকা।

তীর্থদর্শনের দ্বিতীয়াংশ প্রকাশিত হইল; ইহাতে দক্ষিণদেশের মহিস্থররাজ্যের অন্তর্গত বেঙ্গলুর, মহিস্থর ও শ্রীরঙ্গপত্তনের বিবরণ, উত্তর অরুকড়ু জেলার অন্তগত সুপ্রসিদ্ধ তিরুপতি, বেল্লুর, বিরিঞ্চিপুর, পল্লিকোণ্ডে, তিরুবিল্বম্, অরুকড়ু, শোলিঙ্গ, তিরুতানি, কালহস্তী ও নারায়ণবনের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে; তন্মধ্যে বেঙ্গলুর ও অরুকড়ু হিন্দুদিগের তীর্থস্থান না হইলেও তাহাদিগের ঐতিহাসিক বিবরণ এইস্থানে প্রদত্ত হইল। সকল স্থানেরই পুরাবৃত্ত যথাসাধ্য সংগৃহীত হইয়াছে। মহোদয়গণ! তীর্থদর্শনের প্রথমাংশের ন্যায় দ্বিতীয়াংশ অনুগ্রহ করিয়া পাঠ করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রী—

তীর্থদর্শন।

(দ্বিতীয় অংশ)

বেঙ্গলুর।

১৮৯০ খৃঃ জুনমাসে দক্ষিণ-অরুকন্দু হইতে উত্তর-অরুকন্দু যাত্রাকালে আমরা পুদিচারী, মাদ্রাজ, বেঙ্গলুর, মহীসুর ও শ্রীরঙ্গপত্তন দেখিয়াছিলাম। পুদিচারী ও মাদ্রাজ সহরের বৃত্তান্ত প্রথমাংশে দেওয়া হইয়াছে; এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় বেঙ্গলুর, মহীসুর ও শ্রীরঙ্গপত্তনের সঙ্ক্ষেপ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

২রা জুন অপরাহ্ণে বেঙ্গলুর যাইবার মানসে মাদ্রাজ সেণ্ট্র্যাল ষ্টেশনে উপস্থিত হই; ইহা মাদ্রাজ রেলওয়ের টার্মিনস্ ষ্টেশন এবং ইহার গঠনপ্রণালী সর্ব্ব প্রকারে উৎকৃষ্ট। এই মাদ্রাজ রেলওয়ের যে দক্ষিণ-পশ্চিম লাইন আছে, বেঙ্গলুর যাইতে হইলে ঐ লাইন দিয়া যাইতে হয়। আমরা ষ্টেশনে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া বসিলাম। ৫।৪৫ মিনিটের সময় মেলট্রেন ছাড়িয়া দিল এবং আমরাও প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। ৭।১৭ মিনিটের সময় আর্কোনম্ ষ্টেশনে পৌছি-

লাম; ইহা একটি জংসন ষ্টেশন, এই স্থান হইতে মান্দ্রাজ দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম লাইন দ্বয় পৃথক্ হইয়াছে এবং এস, আই, আর্, কর্ডলাইন কাঞ্চীপুর হইয়া চিঙ্গলপুত গিয়াছে। কাঞ্চীপুর যাইতে হইলে আর্কোনম্ ষ্টেশনে নামিতে হয়। আর্কোনম্ জংসন ষ্টেশন বলিয়া এই স্থানে গাড়ী প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা থাকে।

আর্কোনম্ হইতে রাত্রি ৭।৪৭ মিনিটে গাড়ী ছাড়িয়া ১২।৭ মিনিটের সময় জলারপেট নামক জংসন ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছিল। এই ষ্টেশন হইতে বেঙ্গলুরের লাইন আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানে গাড়ী বদল করিবে মনে করিয়া অনভিজ্ঞতা বশতঃ আমরা নামিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম, কিন্তু ষ্টেশনে আসিয়া আমাদিগের সে ভ্রম ভাঙ্গিল; প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী মেন্‌লাইন হইতে বেঙ্গলুর লাইনের সাইডিঙে লইয়া গেল এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণ গাড়ী বদলাইয়া বেঙ্গলুর লাইনের গাড়ীতে উঠিল। এখান হইতে মহীসুরের অধিত্যকা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া রেল রাস্তাও ক্রমশঃ ঢাল হইয়াছে। এমন কি, কোন স্থানে ৬৮ ফুটে ১ ফুট চড়িয়াছে; রাত্রিকাল বলিয়া আমরা প্রকৃতির শোভা কিছুই দেখিতে পাইলাম না, অতএব সুখে নিদ্রা যাইতে যাইতে বেঙ্গলুর গিয়া পৌঁছিলাম।

বেঙ্গলু নামে এক প্রকার লম্বা শিম্বফল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে বলিয়া বোধ হয়, বেঙ্গলুরু এই নাম হইয়াছে;

এবং উহার অপভ্রংশ বেঙ্গলুর; এই স্থানের নাম হইতে জিলারও নামকরণ হইয়াছে।

এই প্রদেশটি অতি পুরাকাল হইতেই ঐতিহাসিক বিষয়ে প্রসিদ্ধ; এমন কি, ইহা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের অধীনে ছিল। তাঁহারা মলকু-মুগন্ধ-পত্তন নামক স্থানে বাস করিতেন। নবম শতাব্দীর কোন সময়ে চোল রাজবংশীয় কোন বীরপুরুষ বেঙ্গলুর প্রদেশ অধিকার ও এই চোল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া উক্ত প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। বল্লালবংশীয় কোন রাজা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চোলরাজদিগের নিকট হইতে বেঙ্গলুর অধিকার করিয়াছিলেন। বীর বল্লাল নামক জনৈক রাজা ১১৯১ খৃঃ হইতে ১২০১ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী যে, তিনিই বেঙ্গলুর সহর স্থাপন করেন; তাঁহার বংশধরেরা ১৩৬৪ খৃঃ পর্য্যন্ত এই প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং এই বংশের শেষ রাজা মুসলমানদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিলেন। তৎকালে বিজয়নগরের রাজগণ প্রবল হইয়া উঠেন। গণ্ডানামে মরসুদকোলম্-বংশীয় এক ব্যক্তি তৎকালে মগধ নামক স্থানে থাকিয়া বেঙ্গলুর প্রভৃতি স্থান সকল শাসন করিতেন। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ তৈলঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। ইনি বিজয়নগরের রাজার বশ্যতা স্বীকার করিয়া সম্ভবতঃ ১৫৩৭ খৃঃ একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৬৩৮ খৃঃ বিজাপুরের আদিল সাহি রাজাদিগের পক্ষ হইতে মহা-

রাষ্ট্রীয় বীর শাহজী কর্ত্তৃক বেঙ্গলুর প্রদেশ অধিকৃত হয়। শাহজীর যত্নে কর্ণাটদেশ জয় হইয়াছিল বলিয়া বিজাপুরের সুলতান তাঁহাকে বেঙ্গলুরের নায়েব গবর্ণরপদে নিযুক্ত করেন, এবং তৎপ্রদেশের দুর্গ ও বেঙ্গলুর জেলাটি জায়গীর স্বরূপ অর্পণ করেন। শাহজী তাঁহার জীবনের শেষভাগ তথায় অতিবাহিত করেন। ১৬৬৪ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র তুকোজী পিতৃপদে অভিষিক্ত হইয়া তৎপ্রদেশ সকল শাসন করিতে থাকেন। ১৬৭২ খৃঃ দ্বিতীয় আলী-আদিলশার আদেশ অনুসারে তুকোজী তঞ্জাবুরাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং যেরূপে তথায় তিনি আপন আধিপত্য স্থাপন করিয়া মহারাষ্ট্রীয় বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা তীর্থদর্শনের প্রথম অংশে তঞ্জাবুরের বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে। তঞ্জাবুরে থাকিয়া দূরস্থিত বেঙ্গলুর প্রদেশ শাসন করা কঠিন বিবেচনায় উহা মহীসুর-রাজকে তিন লক্ষ টাকায় দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৬৮৭ খৃঃ দিল্লীর সম্রাট্ অরংজিব বাদ্‌শাহের সেনানায়ক কাসিম খাঁ উহা অধিকার করিয়া তিন লক্ষ টাকা মূল্যে মহীসুর-রাজকে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই অবধি, সনদ্রুগ ও দিবন-হল্লী দুর্গ দুইটি এবং অপর কয়েকটি প্রদেশ ব্যতীত বেঙ্গলুর, মহীসুর রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। ১৭৪৯ খৃঃ হাইদারআলি মহীসুর রাজের পক্ষ হইতে দিবনহল্লীর যুদ্ধে আপন বীরত্ব প্রকাশ এবং দিবনহল্লীও সনদ্রুগ দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। ১৭৫৮ খৃঃ মহীসুররাজ উহা তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান

করেন। ১৭৬১ খৃঃ হাইদারআলি স্বয়ং উক্ত দুর্গের সংস্কার ও বহিঃপ্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার ও তাঁহার পুত্রের পরিবারেরা দুর্গস্থ রাজভবনে বাস করিতেন।

১৭৯১ খৃঃ, লর্ড কর্ণওয়ালিস্ টিপুসুলতানের নিকট হইতে ঐ দুর্গ কাড়িয়া লয়েন। ১৭৯৯ খৃঃ, শ্রীরঙ্গপত্তনে টিপুর মৃত্যু হইলে লর্ড হারিস্ উহা মহীসুরের উদৈয়ার রাজাকে প্রত্যর্পণ করেন, এবং তৎপরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা শ্রীরঙ্গপত্তনের বিবরণে দেওয়া হইবে।

১৮১১ খৃঃ, শ্রীরঙ্গপত্তনের জল বায়ু দূষিত হইলে বেঙ্গলুর ইংরাজদিগের সৈন্যনিবাসের হেডকোয়াটর রূপে পরিণত হয়।

১৮৩১ খৃঃ মহিসুর রাজ্যের কার্য্য ইংরাজদিগের হস্তগত হইলে বেঙ্গলুর মহিসুররাজ্যের রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছিল। ১৮৮১ খৃঃ পর্য্যন্ত উহা তথাকার রাজধানী ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১১ই জুন বৈকালে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট ও প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা কর্ণেল অলকট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম।

মান্দ্রাজ আদিয়ার উক্ত সোসাইটির লাইব্রেরীতে পৌছিয়া দেখিলাম, মহীসুর মহারাজের মন্ত্রীবর অনরেবল কে, শেষাদ্রি আয়ার বি, এ, সি, আই, ই, মাষ্টার ফসেটের সহিত সম্মুখের হলে বসিয়া বেদান্ত বিষয়ের কূট তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন, এবং কর্ণেল সাহেব তাঁহাদিগের নিকট বসিয়া উহা শ্রবণ

করিতেছিলেন। হলের সম্মুখে আমাদের গাড়ী পৌছিবামাত্র কর্ণেল সাহেব আমাদিগকে দেখিয়া তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া সাদরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন, এবং শেষাদ্রি আয়ার মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মন্ত্রী-বর শরীর অসুস্থতাবশতঃ ১০ দিনের অবকাশ লইয়া জল, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মান্দ্রাজ আসিয়াছেন। পরে আমাদের বেঙ্গ-লুর যাইবার উদ্দেশ্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীবর, বেঙ্গলুরের অণ্ডর সেক্রেটরী শ্রীনিবাস আচার্য্য ও মহীসুর রাজবাটীর দরবার বক্সী শ্রীযুক্ত নরসিংহ অভর্গল রায়বাহাদুর মহাশয় দ্বয়কে দুই খানি পরিচায়ক পত্র লিখিয়া দিলেন।

মান্দ্রাজ হইতে বেঙ্গলুরের অণ্ডার সেক্রেটরী মহাশয়কে আমাদের পৌছিবার সময় তারযোগে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম।

ষ্টেশনে ট্রেন আসিবামাত্র আচার্য্য মহাশয়ের প্রেরিত শ্রীযুক্ত গোবিন্দ আচার্য্য নামক জনৈক ভদ্রলোক আমাদের গাড়ীর নিকট আসিয়া আমাদের প্রেরিত তারের সংবাদপত্র হাতে করিয়া আমাকে কহিলেন, আমি আপনাদিগকে লইতে আসিয়াছি। তিনি অণ্ডর সেক্রেটরী মহাশয়ের নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় ও বেঙ্গলুর মিউনিপাল স্কুলের শিক্ষক। তৎপরে তিনি আরও কহিলেন, বেঙ্গলুর সহর ষ্টেশনে আপনাদের জন্য গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে; সহর এথান হইতে দূর, অতএব সহর ষ্টেশনে নামিলে সুবিধা হইবে; সুতরাং তাঁহার কথায় আমরা ৬।৫৭ মিনিটের সময় বেঙ্গলুর সহর ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম,

তথা হইতে আমাদের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট বাটীতে আসিয়া দেখিলাম উহা একটি বাগানবাটী; উহা রোসেনবাগ নামে খ্যাত ও সহরের প্রান্তভাগে পথের ধারে অবস্থিত। হিন্দুদিগের থাকিবার জন্য উদ্যানের মধ্যে বৈঠকখানা বাটী নির্ম্মিত আছে, ঐ উদ্যান নানাবিধ বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ; এবং উহাতে জল-সেচনের নিমিত্ত ৩টি কূপ আছে। আমরা এই নির্জ্জন বাগান-বাটী পাইয়া বড়ই প্রীত হইলাম।

কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর আমরা অগুর সেক্রেটরী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই, তাঁহার বাটীতে পৌঁছিয়া দেখিলাম তিনি নিত্যপূজাদিতে নিরত রহিয়াছেন। সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে তিনি বহির্বাটীতে আসিয়া সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক আমাদের সহিত বিবিধপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

তথায় আমাদের থাকিবার সময় অল্প জানিয়া, বেঙ্গলুরের দেখিবার উপযুক্ত স্থান সকল দেখাইবার জন্য গোবিন্দ আচার্য্য মহাশয়কে পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

আমরা প্রথমে লালবাগ দেখিতে যাই; ইহা হাইদার-আলীর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই উদ্যানটি অতি বৃহৎ এবং নানাবিধ দেশীয় ও বিদেশীয় লতা, গুল্ম, ফল, পুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত। ইহার মধ্যস্থিত পথ সকল প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত এবং উহার উভয় পার্শ্বে নানাবিধ রঙ্গের ছোট ছোট লতা, গুল্ম ও ঘাসদ্বারা সজ্জিত, হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন বিবিধ বর্ণের গালিচা বিছান রহিয়াছে। জল সেচনের নিমিত্ত

ক্ষুদ্র জলনালিকা পথের পার্শ্বে রহিয়াছে। উদ্যানটি জয়পুর মহারাজের উদ্যান হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, আমরা দুই ঘণ্টা ভ্রমণ করিয়া উদ্যানের সকল স্থান দেখিয়া উঠিতে পারিলাম না। রীতিমত সকল স্থান বেড়াইয়া দেখিতে হইলে প্রায় ৬। ৭ ঘণ্টা সময় লাগে। স্থানে স্থানে বিশ্রামস্থান ও ইংরাজদিগের জন্য এক স্থানে টিপিনেরও বন্দোবস্ত আছে। উদ্যানের এক অংশে পশুশালা তাহার এক স্থানে নানাবিধ বানর; অন্য স্থানে বড় বাঘ চিতাবাঘ ও গোবাঘা; তৃতীয় স্থানে গণ্ডার প্রভৃতি নানাবিধ পশু; অপর স্থানে পায়রা, ময়ুর, তোতা, কাকাতুয়া, চিড়িয়া শ্বেতকাক ইত্যাদি পক্ষী সকল অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে। এই লালবাগ দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। আমাদের সময় অল্প এবং বেলা অধিক হইল দেখিয়া দর্শনে তৃপ্তিবোধ না হইলেও মিউসিয়ম্ (অর্থাৎ আশ্চর্য্য দ্রব্যের আলয়) দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দেওয়ান আফিসের ঠিক সম্মুখস্থিত; ভূতবিভাগের দৃশ্য অতি চমৎকার, তথায় সর্ব্ব প্রকার প্রাণী সজ্জিত রহিয়াছে। অস্ত্রবিভাগে ভারতীয় এবং অন্য প্রদেশীয় বিবিধ প্রকার অস্ত্র, ছোরা, ছুরী, হাতিয়ার; বস্ত্রবিভাগে নানাবিধ রেশমী, পশমী বস্ত্রের আদর্শ; শস্যবিভাগে বিবিধ প্রকার ধান্য, গম, সরিষা আদির নমুনা; তৎপরে খনিজবিভাগে নানা প্রকার প্রস্তর রীতিমত সজ্জিত রহিয়াছে। মহীসুর বিভাগের অন্তর্গত কোলার নামক স্থানে একটি স্বর্ণের খনি আছে, তাহা

বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন; তথায় ইংরাজবণিক্ কোম্পানী ষ্টিম্ ইঞ্জিনের সাহায্যে খনি হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করিতেছেন। যে প্রস্তরে স্বর্ণ পাওয়া যায়, সেই প্রস্তরের নানাবিধ নমুনা রহিয়াছে। অতঃপর আমরা হস্তিদন্ত নির্ম্মিত আগরার তাজ, দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদ, শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথ স্বামীর, মন্দির, তঞ্জাবুরের বৃহতীশ্বর মহাদেবের মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম।

নিম্ন তলায় একদিকে পুরাণ বুদ্ধ, জৈন ও পৌরাণিক মূর্ত্তি সকল সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে।

এই সমস্ত ভাল করিয়া দেখিতে হইলে এক সপ্তাহ সময় আবশ্যক, কিন্তু আমরা দেড়ঘণ্টার মধ্যে কোন প্রকারে দর্শন সমাধা করিয়া বেঙ্গলুর হাইকোর্ট ও কলেজবাটী সন্দর্শনপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট বাসাবাটীতে উপস্থিত হইলাম। আহারান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর পুনরায় দেওয়ান আফিসের দিকে আসিলাম। এই বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা চীফ ইঞ্জিনিয়ার জেনেরল সেনকীর সময় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গ্রীসিয়ান্ ষ্টাইলের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বৃহৎ বাটীতে মহীসুর গবর্ণমেণ্টের প্রায় সমস্ত আফিসই আছে। এখান হইতে মহারাজের নূতন প্রাসাদ দেখিতে যাই; উহা সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে ও এখনও সম্পূর্ণ কার্য্য শেষ হয় নাই। রন্ধনশালা হইতে প্রাসাদে আসিবার আচ্ছাদিত পথটি নির্ম্মাণ হইতেছে। এই প্রাসাদ অতি প্রকাণ্ড, পরিষ্কৃত ও দেখিতে অতি সুন্দর; উহার প্রাঙ্গণ এবং উদ্যান এক তৃতীয় বর্গমাইল হইবে।

ভূতপূর্ব্ব মহারাজ কখন বেঙ্গলুরে আসিতেন না। বর্ত্তমান মহারাজ অনেকটা ইংরেজী অনুকরণে চলিয়া থাকেন। বেঙ্গলুরে সময়ে সময়ে আসিয়া থাকিবার জন্য এই প্রাসাদটি নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা এই রাজভবনের প্রত্যেক ঘর দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলাম।

প্রাসাদ ও দেওয়ান আফিসের সম্মুখে যে বৃহৎ পার্ক আছে, তাহা কুবন পার্ক নামে খ্যাত। চীফকমিসনর কুবন সাহেব উক্ত পার্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে রেসিডেণ্ট সাহেবের বাঙ্গলা বাটী; কুবন সাহেবের প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তিও এখানে বিরাজমান রহিয়াছে। এই পার্কটি দেখিবার উপযুক্ত বটে; প্রাসাদের কিঞ্চিৎ দূরে দেওয়ান বাটী এবং ইহার পূর্ব্বোত্তরদিকে দেওয়ান আফিস।

বেঙ্গলুর সমুদ্র-সমতল হইতে ৩১১৩ ফুট উচ্চ। এখানে শীতের ভাগই অধিক, গ্রীষ্ম অতি অল্প। আমরা জুনমাসে গিয়াছিলাম, তখনও শীতল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, অর্থাৎ বঙ্গদেশে অগ্রহায়ণ মাসের ন্যায় শীত বোধ হইতে লাগিল। শীত ঋতুতে কলিকাতায় যে সমস্ত শাকসবুজি পাওয়া যায়, এখানে তৎসমুদয় বার মাসই প্রাপ্য; কপি, আলু, শালগম, গাজোর, শিম্, মটরশুটী ইত্যাদি প্রচুর। বঙ্গদেশে শীত ভিন্ন অন্য সময়ে আলু জন্মায় না, কিন্তু এখানে যে জমী হইতে আলু তুলিতেছে, আবার ২।৪ দিনের মধ্যে সেই জমী মেরামত করিয়া পুনরায় আলু পাতিতেছে। আম্র কোন বৃক্ষে পাকিয়াছে,

কোন বৃক্ষে কাঁচা, আবার কোন বৃক্ষে বকুল ধরিয়াছে। কমলা-লেবু, আঙ্গুর, আপেল, নাশপাতি, দাড়িম্ব, খর্জ্জুর, পেয়ারা, পেঁপে, আনারস, কাঁঠাল, কদলী ইত্যাদি সকল ঋতুতেই সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। লাউ, উচ্ছে, বেগুণ, মূলা, কপি (বাঁধা, ফুল ও ওল), ওল, কাঁচা লঙ্কা, পেয়াজ, রসুন সমস্তই বারমাসই পাওয়া যায়, কেবল পটল দেখিলাম না।

এখানকার জল বায়ু অতি উত্তম বলিয়া অনেক ইংরেজ বেঙ্গলুরে আসিয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

প্রতি নবেম্বর মাসে এখানে ঘোড়দৌড় হইয়া থাকে এবং সেই উপলক্ষে মহারাজ এখানে আইসেন, তজ্জন্য উপরোক্ত প্রাসাদটি নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাসাদের চারিদিকে রাজোদ্যান প্রস্তুত হইতেছে, নূতন নূতন বৃক্ষ সকল রোপিত হইয়াছে ও হইতেছে। ৫।৭ বৎসর পরে উহাও লালবাগ সদৃশ মনোহর হইয়া উঠিবে তাহার সন্দেহ নাই। রাজভবন দেখা হইলে আমরা বেঙ্গলুর ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট দেখিতে গিয়াছিলাম।

মাদ্রাজ বিভাগের মধ্যে বেঙ্গলুর ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও ও মহীসুর ডিবিসনের হেড কোয়াটার। বেঙ্গলুর ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট মহীশুর গবর্ণমেণ্টের ভিতর হইলেও ইংরেজ শাসনের অধীন। মহীশুরের রেসিডেণ্ট ক্যাণ্টন্‌মেণ্টের প্রধান সিবিল কর্ম্মকর্ত্তা। এখানে অনেকগুলি পদাতিক অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ, রেজি-মেণ্ট আছে।

পর দিবস ১৪ই জুলাই শনিবার প্রাতে তুলা এবং পশমের

কলবাটী দেখিতে গিয়াছিলাম; এই কলের একাংশে ভেড়ার লোমের নানাবিধ কম্বল প্রস্তুত হইতেছে; একটা লম্বা লৌহের চৌবাচ্চায় গরম জল আসিবার বন্দোবস্ত রহিয়াছে, এক জন ক্রমাগত উহাতে ভেড়ার লোম দিতেছে, কলের দ্বারা লোম সকল পরিস্কৃত হইয়া উপরে আসিয়া পড়িতেছে এবং উক্ত লোহার চৌবাচ্চার ময়লা জল এক পার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে, জল কমিলেই আবার গরম জল আসিতেছে; এই রূপে লোম ধুইয়া পরিস্কৃত হইলে তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া কলে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তথা হইতে পিঁজিবার মত হইয়া ক্রমে সুতা হইয়া অন্য এক স্থানে তাঁতে চড়ান হইলে ক্রমে টানা পড়েন দ্বারা কাপড় বোনার মত হইয়া কম্বল প্রস্তুত হইতেছে। কোন কোন তাঁতে এবং কোথাও একেবারে ৪ খানি প্রস্তুত হইতেছে। কল হইতে বাহির হইয়া আসিলে তাহা এক এক খণ্ড করিয়া কাপড়ের গাঁইট সদৃশ বান্ধাই হইতেছে।

উপরোক্ত এক কলেই অন্যদিকে তুলা পেঁজাই হইয়া স্থূল পাঁজ হইতেছে, ক্রমে সূক্ষ্ম সুতা প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহা ওজন হিসাবে মোড়ক বদ্ধ হইতেছে, পরে তাহাতে নম্বর আঁটিয়া প্যাক্ হইয়া রপ্তানি হইতেছে; এক কলে দুই কার্য্য চলিতেছে।

মহারাজের আর একটি কল আছে, তাহার একদিকে গম্ পেসাই হইয়া ১নং ২নং প্রভৃতি ময়দা এবং সুজী প্রস্তুত হইতেছে; অপর দিকে তুলা পেঁজাইয়া সুতা প্রস্তুত হইয়া রপ্তানি হইতেছে। এই কলবাটীর অপর দিকে একটি নূতন

বাটী নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে দেশী কাপড় বুনিবার কল বসিবে, সত্বর কল আসিয়া পৌঁছিবে।

তূলা এবং কাপড়ের কল যত বৃদ্ধি হইবে ততই আমাদের দেশের মঙ্গল। এই জেলার প্রায় সকল স্থানেই দেশীয় জোলারা কম্বল প্রস্তুত করিয়া থাকে। বেঙ্গলুরের কম্বল অতি প্রসিদ্ধ।

কাগজের একটি কল হইবার কল্পনা হইতেছে, কল্পনাটি যদি কার্য্যে পরিণত হয়. তাহা হইলে বড় সুখের বিষয়। তথা হইতে নগর পরিদর্শন করিয়া আবাসে আসিলাম; আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর মহিসুর যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

আমরা এখানে ৩২ ঘণ্টা মাত্র ছিলাম; অতএব এত অল্প সময়ের মধ্যে এই সুবৃহৎ নগর উত্তমরূপে দেখা সম্ভবপর নহে। উত্তমরূপ দেখিতে হইলে অন্ততঃ ১৫ দিন সময় লাগে। কিন্তু আমাদের সময় অতি অল্প; এক্ষণে আমরা মহিসুর রাজধানী দেখিবার উদ্দেশে ১।৩০ মিনিটের ট্রেণে যাইতে উদ্যত হইলাম।

মহিস্থর।

মহিস্থর গমনেচ্ছায় বেঙ্গলুর সহর রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইয়া জানিলাম পূর্ব্বদিবস রায়বাহাদুর শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয় আমাদের মহিস্থর যাইবার বিষয় মহিস্থরের রাজদরবার বক্সী শ্রীযুক্ত নরসিংহ অভর্গল রায়বাহাদুর মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন। শ্রীযুত গোবিন্দ আচার্য্য মহাশর আমাদের সহিত পরিদর্শক-রূপে যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া শুনিলাম, পুনা হইতে ট্রেণ আসিতে সে দিবস ১ ঘণ্টা বিলম্ব হইবে। বেঙ্গলুর হইতে মহি-স্থর পর্য্যন্ত যে রেলপথ আছে, উহা মহিস্থররাজষ্টেট রেলওয়ে হইলেও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রা রেলওয়ে কোম্পানির দ্বারা উহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। দক্ষিণ মহারাষ্ট্রারেলওয়ের উত্তর পশ্চিম টার্‌মিনাস্ পুনা হইতে লণ্ডা ও হুব্‌লি জংসন হইয়া হরিহর জংসনে আইসে। এই স্থান হইতে মহিস্থর রেলওয়ে আরম্ভ হইয়াছে; পুনা হইতে মেলট্রেণ হরিহর ও বেঙ্গলুর হইয়া বরাবর মহিস্থর আসিয়া থাকে। পুনা হইতে মহিস্থর আসিতে ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগে। মেলট্রেণ বেঙ্গলুরে বেলা ১।১৫ মিনিটে আসিবার নির্দ্ধারিত সময় কিন্তু অনেক সময়ে বিলম্ব হইয়া

থাকে। সে দিবস গাড়ী আসিতে এক ঘণ্টা বিলম্ব হইবে শুনিয়া আমরা রেলওয়ে ষ্টেশনের বিশ্রাম গৃহের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ট্রেণ আসিলে উঠিয়া বসিলাম, পরে বেলা ২।৫৬ মিনিটে গাড়ী বেঙ্গলুর হইতে ছাড়িয়া দিলে, হুহু শব্দে চলিতে লাগিল এবং আমরা প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। বেঙ্গলুর ষ্টেশন পার হইয়া আর বসতি দেখিতে পাইলাম না। রেলপথ জঙ্গল ও পাহাড়ের মধ্য দিয়া গিয়াছে। কোঙ্গারি ও বিজাড়ি ষ্টেশন দ্বয় বনমধ্যস্থিত। বিজাড়ি হইতে মদ্দুর পর্য্যন্ত লোকের বসতি এবং জমীর আবাদ আদি দেখা গেল। অপরাহ্ন ৬ টার সময় গাড়ী মদ্দুরে আসিয়া পৌঁছিল, ইহা একটি প্রধান ষ্টেশন। এখান হইতে ৩০ মাইল দূরে কাবেরী নদীর জলপ্রপাত এবং তথায় যাইবার জন্য পাকা রাস্তা আছে। দেশীয় গরুর গাড়ী করিয়া ষ্টেশন হইতে ঐ জলপ্রপাত দেখিতে যাইতে হয়; এখানকার জলপ্রপাত অতি মনোহর, এমন কি ভারতবর্ষের মধ্যে এরূপ দৃশ্য আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইচ্ছা থাকিলেও এ দৃশ্য দর্শন আমাদের ঘটিয়া উঠে নাই। গাড়ী যথা সময়ে চলিতে লাগিল, অপরাহ্ন হইলে প্রকৃতির মূর্ত্তি ধীরে ধীরে অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন হইল এবং আমরা ভগবানের নাম করিতে করিতে চলিলাম। রাত্রি ৮।২০ মিনিটের সময় গাড়ী মহিসুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিবার পরে একটি ভদ্রলোক আমাদের সম্মুখে আসিয়া সদালাপের পর কহিলেন "দরবার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নরসিংহ আয়াঙ্গার রায় বাহাদুর মহাশয়ের

আদেশক্রমে আমি আপনাদিগকে লইবার জন্ম আসিয়াছি, এবং বাহিরে রাজকীয় শকট অপেক্ষা করিতেছে।” আমরা তাঁহার কথায় রেলগাড়ী হইতে নামিয়া রাজকীয় শকটে আরোহণ-পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌছিলাম। দুইটি নূতন ছত্রবাটী একাবয়বে শ্রীযুক্ত নন্দরাজ-সুর নামক কোন রাজবংশীয় ব্যক্তির ব্যয়ে এবং মহারাজের ষ্টেটের তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। বাটী দুইটির নির্ম্মাণ কৌশল বঙ্গদেশের সদরবাটীর সদৃশ। আমাদের থাকিবার জন্য যে ঘর পাইয়াছিলাম, তাহার দুইদিকে বারাণ্ডা, জানালা ও দরজায় খড়খড়ী সার্শী দেওয়া ; এরূপ ঘর ফটকের দুই পার্শ্বে দুইটি আছে এবং ভদ্রলোকদিগের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। অন্যান্য ঘরগুলির সম্মুখদিকে বারাণ্ডা ও প্রত্যেক ঘরে রন্ধন করিবার বন্দোবস্ত আছে; সাধারণ লোকে তথায় থাকে। বাটীর প্রাঙ্গণ ক্রোটন্ এবং দেশীয় পুষ্প বৃক্ষে সুশোভিত রহিয়াছে। বাটীর চতুর্দ্দিকে নূতন পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত হইতেছে। উপরি তলে সম্মুখদিকে যে দুইটি ঘর আছে, তাহা এ পর্য্যন্ত কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় নাই। অপর বাটীতে মহিসুরের জজ মহাশয় তৎকালে বাস করিতেছিলেন। এই বাটী দ্বয়ের প্রত্যেকটির নির্ম্মাণ ব্যয় ২০ হাজার টাকার কম হইবে না।

আমরা পৌছিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় আয়াঙ্গার মহাশয় আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। অনেকক্ষণ আলাপ পরিচয়ের পর বিদায় গ্রহণ করিবার সময় বলিয়া

গেলেন যে পর দিবস প্রাতে আপনাদের জন্য দরবার-আর্দ্দালী রাজকীয় শকট লইয়া আসিবে ও সে আপনাদের ভ্রমণকাল পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। পর দিবস রবিবার প্রাতে একজন দরবার পিয়ন্ শকট আসিয়াছে বলিয়া সংবাদ দিলে, আমরা অনতিবিলম্বে মহিসুরের চামুণ্ডাপাহাড়স্থিত চামুণ্ডাদেবী দর্শনার্থে বহির্গত হইলাম। গাড়ী দুর্গের ভিতর হইয়া চামুণ্ডা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, আমরা এই সুযোগে নগর দেখিতে দেখিতে চলিলাম।

এখানে মহিসুর দেশ ও নগরের সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক বোধে তাহা প্রদত্ত হইতেছে।

পৌরাণিক মহিষাসুরের বিবরণ অনেকেই জ্ঞাত আছেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে চণ্ডীমাহাত্ম্যে ও দেবীভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ইহা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। দক্ষিণপ্রদেশে প্রবাদ এই যে, মহিসুরপ্রদেশে পৌরাণিক মহিষাসুরের রাজত্ব ছিল। আবার কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন, যে বাল্মীকি কথিত সুগ্রীবরাজ মহিসুর প্রদেশে রাজত্ব করিতেন; কিন্তু এখানে আমরা সুগ্রীবরাজের কোন বিবরণ শুনিলাম না।

খৃঃ ৩০০ বৎসরের পূর্ব্বে কোন সময়ে সম্ভবতঃ অশোকরাজের রাজত্বকালে এই প্রদেশে বৌদ্ধেরা একটি আবাস স্থাপন করিয়াছিলেন; তদনন্তর জৈনেরা আসিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত আধিপত্য করিয়াছিল। এ প্রদেশে তাহাদের কৃত গুহা-মন্দির ও মূর্ত্তি পাহাড়ের গায়ে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কদম্ববংশীয়

রাজগণ মহিসুরের উত্তরদিকে বনবাসী নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া বহু শতাব্দী রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহিসুর অধিত্যকার দক্ষিণদিকে গঙ্গাবংশীয় রাজগণ বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের যে সকল অনুশাসন-লিপি পাওয়া যায় তাহাতে তাঁহারা জৈনমতাবলম্বী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহারা ক্রমে হীনবল হইলে, জৈনমতাবলম্বী বল্লালবংশীয় রাজগণ প্রবল হইয়া উঠেন; এই জৈনরাজগণ রামানুজাচার্য্যের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন; প্রথমে ইহাঁদের রাজধানী যাদবপুরীতে ছিল, পরে তদ্বংশীয় কোন বীরপুরুষ তথা হইতে দ্বারসমুদ্রনামক স্থানে আসিয়া আপন রাজধানী স্থাপন করেন। ১৩১০ খৃঃ আলাউদ্দানের সেনানায়ক মালিককাফুর কর্তৃক ঐ বল্লালবংশীয় দ্বারসমুদ্রের রাজা পরাভূত হইয়া বন্দীরূপে দিল্লীতে প্রেরিত হওয়া অবধি বল্লালবংশ লোপ পাইয়াছে, কথিত আছে, ১৩৯৯ খৃঃ যাদববংশীয় বিজয়রাজ নামক কোন বীরপুরুষ তৎকনিষ্ঠ কৃষ্ণরাজের সহিত দ্বারকা হইতে দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া মহিসুরের সন্নিকটে হদরনারু নামক স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৫২৪খৃঃ তদ্বংশীয় রাজগণ মহিসুরনামক স্থানে আসিয়া প্রথমে বাস করেন; পরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেইস্থান রাজধানীতে পরিণত করেন। রাজা উদৈয়ার পূর্ব্বোক্তবিজয়রাজ হইতে নবম পুরুষ অন্তর বলিয়া বোধ হয়। তিনি মহিসু পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। উদৈয়ার রাজাদিগের বিবরণ শ্রীরঙ্গপত্তনে দেওয়া হইবে।

মহিসুর নগরের আয়তন প্রায় ৩ বর্গমাইল হইবে, ১৮৮১ খৃঃ লোকসংখ্যা তালিকায় উক্ত সহরের অধিবাসীর সংখ্যা ২৮,৯৭৯ জন হইয়াছিল। নগরটি চামুণ্ডা পাহাড়ের পদদেশে অবস্থিত, দুর্গটি সহরের দক্ষিণদিকে, দীর্ঘে ও প্রস্থে ৪৫০ গজ হইবে; ইহার প্রাচীর এখনও পরিষ্কৃত রহিয়াছে, কিন্তু বাহিরের পরিখা ভরাট করিয়া পুষ্পোদ্যানে পরিণত করা হইতেছে। দুর্গমধ্যস্থ পথগুলি অপ্রশস্ত, কিন্তু নগরের পথগুলি সুপ্রশস্ত এবং উত্তম পরিষ্কৃত। এখানকার বাটীগুলি কুন্তালাচ্ছাদিত কিন্তু খাপরেলের নীচে ছাদ থাকাপ্রযুক্ত গৃহের অভ্যন্তর বিশেষ উষ্ণ হইতে পারে না, যাহা হউক, নগরটি অতি পরিষ্কার এবং সমৃদ্ধিশালী। এখানে মিউনিসিপালিটির বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে।

নগরের দক্ষিণদিকে দুর্গ এবং তন্মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণের বাস। দুর্গের মধ্যভাগে প্রাসাদ এবং রাজবংশীয় আত্মীয়গণের ভবন। আমরা দুর্গের মধ্য দিয়া চামুণ্ডা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছিলাম, ইহা নগর হইতে প্রায় ২॥ মাইল দুরে হইবে।

আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া ক্রমে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম; উহাতে উঠিবার যে সোপান আছে তাহা অতি পুরাকালে পাথর কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই সোপান দিয়া অনেক কষ্টে ১॥ ঘণ্টায় উপরে উঠিলাম; উপরে এক পার্শ্বে চামুণ্ডাদেবীর মন্দির, তন্নিকটে অর্চ্চকদিগের বাস; অপর পার্শ্বে মন্দিরের সমতল হইতে ২০০ ফুট উপরে মহারাজের বিশ্রাম ভবন। ইহার পার্শ্ব দিয়া নিম্ন হইতে গাড়ীর পথ আসি

য়াছে, উক্ত রাস্তার এক শাখা মহারাজের বিশ্রাম ভবন দিকে এবং অপর শাখা মন্দিরের দিকে আসিয়াছে। গাড়ীর রাস্তা পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে ৫ মাইল এবং সোপানের পথ প্রায় ১৷৷ মাইল হইবে। ভূমির সমতল হইতে পাহাড়ের উচ্চতা ১০০০ ফুটের কম নহে; তথা হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোহর, যিনি এ অপরূপ দৃশ্য দেখিয়াছেন তিনিই তাহা অনুমান করিতে পারেন।

এখান হইতে মহিসুর রাজ্য সমস্তই দৃষ্টিগোচর হয়, এক দিকে দুর্গ মধ্যস্থ রাজভবন, অপর দিকে শ্রীরঙ্গপত্তন, এবং অন্য দিকে অতি দূরে কাবেরীনদীর জলপ্রপাত দেখা যায়।

কিয়ৎক্ষণ পরে মন্দিরের প্রধান ধর্ম্মযাজক, যে স্থানে দেবী কর্ত্তৃক মহিষাসুর নিহত হইয়াছিল, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে সেই স্থান দেখাইয়া দিলেন। উহা পাহাড়ের পাদদেশ হইতে এক মাইল দূর হইবে।

চামুণ্ডাদেবী মহিষাসুরকে বধ করিয়া পর্ব্বতে আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই আদেশক্রমে পর্ব্বতের উপর মূল স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, পরে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

উক্ত দেবী মহিসুর রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং মহিসুর রাজাদিগের কুলদেবী; অতএব এই মন্দির মহিসুরের রাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন্ সময়ে এবং কোন্ মহাত্মার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার বিবরণ পাওয়া সুকঠিন। মন্দিরের অবস্থা দৃষ্টে অনু-

মান হয় যে, ইহা ৪।৫ শত বৎসরের হইবে। গঠনপ্রণালী দক্ষিণদেশের অন্যান্য দেবালয়ের সদৃশ; মন্দিরটি ৭টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত; সুবিস্তৃত অঙ্গণ এবং চতুর্দ্দিক প্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, সম্মুখে গোপুর নামে প্রকাণ্ড সিংহদ্বার, উহার ঊর্দ্ধদিকে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে।

শুনিলাম, মহিস্থর রাজবংশের নিয়মানুসারে এই মন্দিরে রাজকুমার এবং রাজকুমারীদিগের নামকরণ হইয়া থাকে। দেবীর দর্শন এবং অর্চ্চনার নিমিত্ত আমরা সপ্তম প্রকোষ্ঠদ্বারে গিয়া দাঁড়াইলাম; পূজক আসিয়া আমাদের প্রতিনিধিরূপে কুঙ্কুম দ্বারা সহস্র নামের অর্চ্চনা করিয়া কর্পূরালোকে আরতি করণান্তর দেবীমূর্ত্তি দেখাইলেন। দেবী প্রস্তরময়ী, অষ্টভুজা, সিংহবাহিনী (সিংহের উপর দণ্ডায়মানা) অসুরের মহিষাকৃতি দেহ, সিংহের দিকে পৃষ্ঠ হইলেও নরাকৃতি মস্তক ঘুরাইয়া দেবীর দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে; দেবী দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল দ্বারা অসুরের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ ও বামহস্তে নাগপাশ দ্বারা উহাকে দৃঢ় বন্ধন করিয়াছেন, আর অন্যান্য হস্তে অন্যান্য আয়ুধ, যথা তরবারী, তীর, ধনুক ইত্যাদি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। চালের উপর চিত্রে, দেবর্ষি, মহর্ষি, যক্ষ, রক্ষাদি সকলেই দেবীর স্তব করিতেছেন। বঙ্গদেশে দশভুজার প্রতিমায় দেবীর দক্ষিণে লক্ষ্মী, গণপতি এবং বামদিকে সরস্বতী ও ময়ুরবাহনে ষড়ানন; দেবীর দক্ষিণপদ সিংহোপরি ও বামপদ অসুর স্কন্ধে প্রদত্ত হইয়া থাকে। সিংহ গণপতিকে পেছনে করিয়া অসুরের

সম্মুখীন হইয়া তাহার হস্ত দংশন করিয়া থাকে। এখানে গণপতি, লক্ষ্মী, ষড়ানন, সরস্বতী নাই এবং দেবীর উভয় পদই সিংহোপরি, সিংহের পৃষ্ঠদেশ অসুরের দিকে হইলেও মস্তক ঘুরাইয়া অসুরকে ধরিয়া রহিয়াছে।

দেবমূর্ত্তি দর্শনে পুলকিত হইয়া প্রসাদ গ্রহণান্তর বাহিরে আসিয়া শারদীয় পূজার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে, সেই সময়ে শতাবধি বেদপারগ ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়া যাগ, হোম, শ্রীসূক্ত, ভূসূক্ত, মন্যুসূক্ত, পুরুষসূক্ত, পঞ্চ অক্ষর জপ নয় দিন করিয়া থাকেন; সপ্তশতী চণ্ডীও পাঠ হইয়া থাকে। নৈবেদ্যের ছড়াছড়ি শুনিলাম না, তবে অন্নব্যঞ্জনের মহানৈবেদ্য হয়, তাহাই ব্রাহ্মণগণ রজনীতে প্রসাদ পাইয়া থাকেন। আমরা বিশেষরূপ জ্ঞাত হইলাম যে, দেবীর সম্মুখে পশু বলি হয় না, তবে পর্ব্বতের নিম্নে পথের পার্শ্বে শূদ্রজাতিগণ দেবীর উদ্দেশে পশু হনন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে মন্ত্রপাঠ হয় না। এখানে শারদীয় পূজার পরিবর্ত্তে নবরাত্রব্রত কহে; দেবীর মন্দিরে এইরূপে উক্ত ব্রত সমাধা হইয়া থাকে।

রাজভবনে মহারাজ যেরূপে নবরাত্রব্রত করিয়া থাকেন, তাহা পরে বিবৃত করিতেছি। হোম, জপ ও সপ্তশতী বেদপাঠ এ প্রদেশে পূজার প্রধান অঙ্গ। পশু বলির নাম গন্ধও নাই, ইহাই সাত্ত্বিকপূজা। বঙ্গদেশে পূজার প্রধান অঙ্গ পশুবলি ও নৈবেদ্য তাহা রাজসিক ও তামসিক পূজা।

দেবীর মন্দিরের সন্নিকটে নৃসিংহদেবের মন্দির আছে,

বোধ হয় চিক্কাদেবরাজের সময় এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে; তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইতেন, কিন্তু তিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ও তদবধি মহিসুর রাজবংশীয়েরা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইতেন; রাজপ্রাসাদেও আর এক নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি আছে, তাঁহারও প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে। উক্ত চিক্কাদেবরাজ ১৬৭০ খৃঃ হইতে ১৭০০ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; অতএব এ মন্দির৩০০শত বৎসরের অধিক হইবে। মন্দিরের গঠনপ্রণালী অতি উত্তম; আমরা তথায় যাইয়া বিষ্ণুর অর্চ্চনাদি করিয়া মহারাজের বিশ্রামাগারে যাইলাম। এই বৃহৎ অট্টালিকা দেবীর মন্দির হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত। তথায় সর্ব্বদাই শীতল বায়ু বহিয়া স্থানটিকে শীতল করিয়া রাখিয়াছে। তথা হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি রমণীয়। রাজপরিবারবর্গ দেবীর পূজা করিতে আসিয়া উক্ত বাটীতে বিশ্রাম করিয়া থাকেন। আমরা তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া দেবীর কিঞ্চিৎ প্রসাদ ভক্ষণ করণান্তর পূর্ব্ব গন্তব্যপথ দিয়া পাহাড়ের নীচে নামিলাম। বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় দেবরাজ নামক হ্রদের নীচে এবং পথের পার্শ্বে স্বর্গীয় রাজাদিগের সমাধিস্থান দেখিতে যাইলাম। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ কৃষ্ণরায়ার সমাধির উপর যে অট্টালিকা তাহা অতি উৎকৃষ্ট; মহারাজ যে বৃহৎ কূর্ম্মাসনের উপর বসিয়া জপ করিতেন, তাহা সমাধির উপর স্থাপিত হইয়াছে ও সেই কূর্ম্মাসনের উপর মহারাজের প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি রহিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্ব-

বর্ত্তী রাজাদিগের এবং অপর রাজপরিবারগণেরও সমাধি দেখিলাম। রাজগণ যে প্রস্তরাসনে বসিয়া জপ করিতেন, সেই প্রস্তর সকল সমাধির[১] উপর রহিয়াছে।

রাজাদিগের যে প্রস্তরময় মূর্ত্তি আছে, তাহা প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে; অপর রাজপরিবারদিগের মূর্ত্তি-পূজা হয় না। এই সমাধি প্রাঙ্গণের সন্নিকটে এক বৃহৎ ছত্র আছে, সেই ছত্রে অভ্যাগত সন্ন্যাসী, সাধু বৈষ্ণবগণ আশ্রয় পাইয়া থাকেন। উক্ত দিবসে কোন পরমহংস সাধু অনেকগুলি শিষ্যের সহিত উক্ত ছত্রে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অতঃপর আমরা তথা হইতে আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। অপরাহ্নে রাজভবন দেখিতে গিয়াছিলাম।

১৭৯৯ খৃঃ টিপুসুলতানের মৃত্যুর পর শ্রীরঙ্গপত্তন ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হইলে, ইংরাজ বাহাদুর মহিসুর-রাজবংশের একমাত্র প্রকৃত উত্তরাধিকারী বন্দী নাবালক রাজা কৃষ্ণরায়ার উদৈয়ারকে মুক্ত করিয়া মহিসুর রাজসিংহাসনে বসাইয়া রাজ্যপ্রদান করিলে পর, মন্ত্রিবর পূর্ণিয়ার যত্নে ১৮০০ খৃঃ শ্রীরঙ্গপত্তনের টিপুর রাজবাটী ধ্বংস করিয়া মহিসুরের রাজবাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজবাটীর সম্মুখে বৃহৎ প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের সম্মুখে নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত চারিটী কাষ্ঠের খুঁটীর দ্বারায় সুরক্ষিত এক প্রকাণ্ড দ্বিতল প্রাসাদ। এই প্রাসাদের নাম নবরাত্র মহল; আমরা এই মহলের নিম্ন-

(১) যথায় শবদাহ বা শব প্রোথিত হয়, সেই স্থানকে সমাধিক্ষেত্র কহে।

ভাগে প্রবেশ করিয়া বামদিগের সোপান দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম, ভিতরে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মহল এবং ভিতর দেওয়াল সর্ব্বত্র নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত রহিয়াছে। প্রথম মহলের সুদীর্ঘ প্রকোষ্ঠ প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া অন্য মহলে উপনীত হইলাম; এখানে এক রৌপ্যনির্ম্মিত বৃহৎ সিংহাসন, কয়েকখানি বহু মূল্যের চেয়ার, টেবিল, সোফা এবং অয়েল-পেন্‌টিং আলেখ্যাদির দ্বারা সজ্জিত রহিয়াছে, উক্ত গৃহের কপাট চন্দনকাষ্ঠে নির্ম্মিত এবং তাহা গজদন্তের কারুকার্য্যে সুশোভিত; এইটি মহারাজের বসিবার গুপ্তগৃহ। ইহার পরে দরবারবক্সীর দপ্তরখানা, তথা হইতে এক প্রকাণ্ড প্রাসাদে যাইলাম, উহাকে ড্রয়িংরুম কহে, উহা নানাবিধ ঝাড় লণ্ঠন সোফা, চেয়ারাদিতে সুসজ্জিত রহিয়াছে। সকল ঘরই অয়েল-পেণ্টিং প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত। অনন্তর দেবালয় মহলে যাইয়া দেখিলাম চামুণ্ডাদেবীর নকল মূর্ত্তি একটি সামান্য গৃহে বিদ্যমান তথায় তাঁহার নিত্য পূজা হইয়া থাকে। সে গৃহ চাবি বন্ধ ও তাহাতে মোহর করা, প্রত্যহ পূজার সময় মোহর ভাঙ্গিয়া দরজা খোলা হয়, এবং পূজান্তে দরজা বন্ধ করিয়া পুনরায় মোহর করা হয়। চামুণ্ডাদেবীর বহু মূল্য আভরণাদি রক্ষার নিমিত্ত প্রত্যহ দরজায় মোহরাঙ্কিত হইয়া থাকে। এই মহলের অব্যবহিত পরেই নৃসিংহদেবের মহল, তথাকার দরজাও বন্ধ এবং মোহর করা, কিন্তু দরজা গুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ থাকা-প্রযুক্ত আমাদের দেবদর্শনের কোন অনিষ্ট ঘটে নাই। মহা-

রাজের বিশ্রামাগার, আলেখ্য গৃহ ও সঙ্গীতাগার পার হইয়া তোষাখানা এবং রাজকর্ম্মচারিদিগের দপ্তর মহল ও নৃত্যশালা দর্শন করণান্তর একটি অপ্রশস্ত পথ পার হইয়া রাজকুমারগণের পড়িবার গৃহ সন্দর্শন করিয়া মহারাজের সুসজ্জিত মন্ত্রণাগৃহে উপনীত হইলাম; তথা হইতে নবরাত্রমহলে গমন করিলাম, এই মহলটি ভারতমাতা ভারতেশ্বরী, ভারত প্রতিনিধি লর্ড ক্লাইব, লর্ড ওয়েলিংটন ও দেশীয় কয়েকটি প্রধান প্রধান রাজাদিগের অয়েলপেন্টিংএর পূর্ণাকৃতিতে সুশোভিত রহিয়াছে। ইহার পার্শ্ব গৃহে একখানি রত্নসিংহাসন আছে, ১৬৯৯খৃঃ চিক্যদেবরাজ দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে উক্ত রত্নসিংহাসন উপহার পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রবাদ যে, হস্তিনাপুরের পাণ্ডবরাজগণ উক্ত সিংহাসনে উপবেশন করিতেন; পাণ্ডববংশের অবনতি হইলে তদ্বংশীয় শেষ রাজা পেন্নিকোণ্ডে নামক স্থানে উক্ত সিংহাসন ভূমিতে প্রোথিত করিয়া রাখেন। বিজয়নগরের রাজ্য-স্থাপক কোন এক সিদ্ধপুরুষের নিকট তদ্বিষয় অবগত হইয়া উক্ত সিংহাসন ভূমি হইতে উত্তোলন করেন, এবং তদবধি উহা বিজয়নগরের রাজাদিগের অধিকারে থাকে। বিজয়নগরের ধ্বংসের পর উহা মহিসুরের উদৈয়ার রাজাদিগের হস্তগত হয়। উক্ত বিষয় কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা স্থির যে চিক্যদেবরাজ এবং তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ টিপুসুল-তানের সিংহাসনারোহণ কাল পর্য্যন্ত উক্ত সিংহাসন ব্যবহার করিয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তনের ধ্বংসের পর, অকর্ম্মণ্য

দ্রব্যাদির সহিত এক ঘরের মধ্যে উহা পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান মহারাজের পিতা কৃষ্ণরায়ার উদৈয়ারের রাজ্যাভিষেক সময় হইতে উক্ত সিংহাসন ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বের ন্যায় সিংহাসনের প্রকৃত শোভা নাই। হস্তিদন্তনির্ম্মিত সুচারু কারুকার্য্যের উপর স্বর্ণ ও রৌপ্যপত্র মণ্ডিত ও তাহাতে পৌরাণিক মূর্ত্তি সকল অঙ্কিত রহিয়াছে। উপরে রাজছত্রের ঝালোর মণি মুক্তা এবং হীরকাদিতে সুশোভিত; মহারাজ নবরাত্র মহলে এই সিংহাসনে বসিয়া নয় দিবস ব্রত পালন করেন, অপর সময়ে ইহা পার্শ্বের ঘরে আবদ্ধ থাকে।

দশেরা উৎসব আমাদের দেখা ঘটে নাই, কিন্তু যেরূপ শুনিলাম সেইরূপে বিবৃত করিতেছি। তৎ সময়ে বহু প্রদেশ হইতে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে; সম্মুখের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অশ্বারোহী সেনা সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়, তৎপরে চিত্রিত সঙীন হস্তে পাইক সকল, তাহার পশ্চাতে পদাতিক সেনা এবং সর্ব্ব শেষে নকীব এবং ধ্বজা বাহকেরা দণ্ডায়মান থাকে। তৎপরে মহারাজ বহু মূল্য মণি মুক্তাদি হীরক খচিত পোষাকে ভূষিত হইয়া উক্ত সিংহাসনে উপবেশন করিলে সম্মুখের আবরণ তুলিয়া দেওয়া হয়, তখন তোপধ্বনি হইতে থাকে; তদনন্তর বৈদিক ব্রাহ্মণগণ রাজার চতুঃপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বেদগান করিতে করিতে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলে বাদ্য বাজিতে থাকে সেনাগণ জয়োচ্চারণ করে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে অশ্বের হ্রেষারবে ও অশ্বারোহীদিগের সঙীনের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে এক

অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়া উঠে; ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি আসিয়া উপস্থিত হইলে তোপধ্বনি দ্বারা তাঁহার আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করা হয়। ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি ও অন্যান্য আমন্ত্রিত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সম্মানার্থে মহারাজের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ তোরণের সম্মুখে উপস্থিত থাকেন ও তাঁহাদিগকে সমাদরে দরবার মহলে আনয়ন করেন।

ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি হইতে অধস্তন সকলেই রাজাকে সম্মান প্রদর্শনার্থ রাজসিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নতশির হইলে, মহারাজ মস্তক ঈষৎ হেলন ও দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা চিবুক স্পর্শ করিয়া সম্মান গ্রহণ করেন। অতঃপর হস্তির খেলা ও জিম্‌নাষ্টিক প্রভৃতি খেলা হইয়া থাকে। তৎপরে মহারাজ স্বয়ং সমরবেশে সেনা-পরিবেষ্টিত হইয়া এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া একটি শমীবৃক্ষে শর ত্যাগ করিলে তোপধ্বনি হয়, তদনন্তর সকলে বিজয়োল্লাসে মত্ত হইয়া রাজভবনে প্রত্যাবৃত্ত হন। প্রথানুসারে পান ও সুপারি বিতরণের পর সভা ভঙ্গ হইলে মহারাজ উক্ত সিংহাসন প্রদক্ষিণ, পূজা এবং প্রণাম করণানন্তর অন্দরমহলে গমন করেন। ইহাই মহারাজের নবরাত্রব্রত।

রাজভবন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত ও সুসজ্জিত। সমস্ত রাজভবন মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোক দিবার বন্দোবস্ত আছে।

প্রাসাদ হইতে ফিরিবার সময় অস্ত্রাগার ও পুস্তকালয় দেখিয়া রাজভবন-সম্মুখস্থ উদ্যানাভিমুখে আসিতে আসিতে শুনিলাম,

মহারাজ বায়ুসেবনার্থ এই পথ দিয়া যাইবেন। তাঁহার নিমিত্ত তোরণের সম্মুখে এক জুড়ি ফিটন অপেক্ষা করিতেছে। ক্ষণকাল পরে মহারাজ অপর এক ব্যক্তির সহিত আসিয়া ফিটনে চড়িয়া নিজে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন, মহারাজের বেশ ভূষা কোট, পেণ্টুলেন ও মস্তকে জরির উষ্ণীষ। শুনিলাম, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার সহোদর, ইনি ৫০০ পাঁচশত টাকা মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন ও অধিকাংশ সময়ই মহারাজের সহিত যাপন করিয়া থাকেন। অতঃপর আমরা উদ্যান দেখিয়া মহারাজের গ্রীষ্মভবন দেখিতে যাই, ইহা মৃত মহারাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া ছিল। এই প্রাসাদের সম্মুখে অশ্বশালা, তাহাতে সম্প্রতি ৮০ আশীটি অশ্ব আছে, সময়ে সময়ে এক শত কুড়িটী পর্য্যন্ত থাকে। উহার এক পার্শ্বে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গাড়ী সকল সজ্জিত রহিয়াছে। মহারাজ বিলাত হইতে কয়েক খানি নূতন গাড়ী আনাইয়াছেন; মৃত মহারাজ যে সকল গাড়ী ব্যবহার করিতেন বর্ত্তমান মহারাজ সে সকল গাড়ী ব্যবহার করেন না; এই গাড়ীগুলি যত্নের সহিত এক পার্শ্বে সজ্জিত রহিয়াছে।

পর দিবস প্রাতঃকালে জগন্মোহন রাজপ্রাসাদ দেখিতে যাইলাম। ইহা একটি চমৎকার অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শ প্রাসাদ দুর্গের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ইহা ভূতপূর্ব্ব রাজার বিশ্রামভবন ছিল। সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ নানাবিধ পুষ্প লতা এবং ছায়াতরু দ্বারা সুশোভিত। উপরতলায় নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য এবং পুরাতন

ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছে। দেওয়ালে ঐতিহাসিক ঘটনার অয়েলপেণ্টিং সুচিত্রিত মূর্ত্তি সকল সজ্জিত রহিয়াছে। এক দিকে শ্রীরঙ্গপত্তনের শেষ অধিকারের ঘটনাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে। সুলতান টিপু শরবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত, এবং তাঁহার কয়েকটি বিশ্বাসী অনুচর নতশিরে অনুতাপ করিতেছে; জেনেরল হেরিস্ সাহেব আপন অনুচরের সহিত শত্রুর মৃতদেহ সন্দর্শন করিতেছেন, এদৃশ্য অতীব শোচনীয়। অপর পার্শ্বে মৃত দেওয়ান রঙ্গাচার্য্যালুর পূর্ণাকৃতির অয়েলপেণ্টিং বিরাজমান। অন্য একস্থানে ভূতপূর্ব্ব মহারাজের কেলিচিত্র, তন্মধ্যে কতকগুলি অশ্লীল মূর্ত্তিও রহিয়াছে। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান মহারাজের সময়ও এরূপ অশ্লীল চিত্র তথায় স্থান পাইয়াছে। অপর এক দিকে বর্ত্তমান মহারাজের কোষ্ঠী দোলায়মান রহিয়াছে ভূতপূর্ব্ব মহারাজা কতকগুলি ব্যাঘ্র ও বন্যপশু যেরূপে শিকার করিয়াছিলেন, তাহার আদর্শ চিত্র অয়েলপেণ্টিঙে চিত্রিত রহিয়াছে; ড্রয়িংহল্, তসবিরাদি ও বহুমূল্যের পল্যঙ্ক সোফাদিতে সজ্জিত। পার্শ্বস্থিত একটি ঘরে অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্ণের কলধৌত পল্যঙ্কে বহুমূল্য সাটিন বস্ত্রে আবৃত একটি শয্যা রহিয়াছে। নিম্নতলে একটি হলে বিলিয়ার্ড খেলিবার সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। অপরাপর ঘরে সোফা, চেয়ার, অয়েলপেণ্টিং, ঘটীযন্ত্র, হারমনিয়ম্ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সকল সজ্জিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজ কখন কখন এই প্রাসাদে আসিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রাসাদের দক্ষিণদিকে গোশালা, তথায় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ন্যূনাধিক ৩০০ তিন শত গাভী রহিয়াছে। গাভীগুলি দেখিতে অতিশয় হৃষ্ট-পুষ্ট, তন্মধ্যে অনেকগুলি বিলাতী গাভীও আছে। গোশালার জন্য একজন তত্ত্বাবধারক বা পরিদর্শক নিযুক্ত আছে। মহারাজ স্বয়ং সপ্তাহে দুইবার ইহা পরিদর্শন করিতে আসিয়া থাকেন।

এখান হইতে বালিকা বিদ্যালয় দর্শন করিতে যাইলাম। ইহা জগন্মোহন প্রাসাদের উত্তর-পশ্চিম কোণে স্থিত। আমরা স্কুলে আসিলে, স্কুলের অধ্যক্ষ এবং মেনেজার মাননীয় শ্রীযুক্ত নরসিংহ আয়াঙ্গার মহাশয় ইহারা দুই জনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আয়াঙ্গার মহাশয় সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে সমুদয় শ্রেণীগুলি, আমাদিগকে যত্নের সহিত দেখাইয়া দিলেন। কএকটী শিক্ষিতা স্ত্রীলোক নিম্ন কএকটী শ্রেণীতে শিক্ষা দিতেছেন, মুখে মুখে পাঠাভ্যাস করাইতেছেন ও ব্ল্যাক্-বোর্ডে লিখিয়া দেখাইয়া শিখাইতেছেন। কাণারী এবং সংস্কৃত কবিতাভ্যাস করাইতেছেন। প্রত্যেক শ্রেণীর বালিকারা সংস্কৃত এবং কাণারী কবিতা আবৃত্তি করিয়া আমাদিগকে শুনাইয়া দিলেন, উপর শ্রেণীর বালিকাদিগকে ইংরেজি সাহিত্য গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, রাসায়নিক, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। দুইজন ইয়ুরোপীয় শ্বেতাঙ্গিনী শিক্ষয়িত্রী কেবল উপরের কয়েকটী শ্রেণীতে শিল্পাদি এবং চিত্রকার্য্য শিক্ষা দিয়া থাকেন। বালিকাগণ যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার

একখানি অতি চমৎকার হইয়াছে। বালিকাদিগকে চিত্র-কার্য্যের উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার ধার্য্য আছে। বিলাতী দুইটী শ্বেতাঙ্গিনী ও দেশীয় ১৩টী শিক্ষয়িত্রী ব্যতীত রাসায়নিক পদার্থবিদ্যাদি শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটি দেশীয় কৃতবিদ্য শিক্ষক আছেন।

অনন্তর সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে যাইয়া দেখিলাম, একটী বিধবা রমণী কাণারী হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন। সেই শ্রেণীর পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে শুনিলাম যে, উক্ত রমণী ভগবদ্গীতা কণ্ঠস্থ করিয়াছেন ও কয়েকখানি উপনিষদ্ পাঠ করিয়াছেন। পণ্ডিতবর আমাদিগের কথামত, সেই ছাত্রীকে ভগবদ্গীতার কোন অংশ আবৃত্তি করিতে বলিলে, প্রথমে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া অম্লানবদনে এক অধ্যায় আবৃত্তি করিলেন; আরও শুনিলাম যে, ভবিষ্যতে ইনি এই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদ প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহার আর একটী সহাধ্যায়িনী আছেন, তিনি সে দিবস উপস্থিত ছিলেন না।

বালিকাদিগকে সকল প্রকার গার্হস্থ্য কার্য্যও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে; সূচের কার্য্য অর্থাৎ কার্পেট বোনা, কাটাকাপড় সেলাই প্রভৃতি কার্য্য এবং রন্ধনাদির প্রকরণও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

গান বাদ্য শিক্ষা দিবার জন্য ২ জন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন, প্রতি দিন ১ ঘণ্টা করিয়া গান শিক্ষা দেওয়া হয়; এতদ্ব্যতীত সপ্তাহে ৩ দিবস ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত বীণাবাদ্য ও গান

শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমরা যে দিবস গিয়াছিলাম সেই দিবস অপরাহ্নে বীণা বাদ্যের দিবস ছিল। রায় বাহাদুর মহাশয় আমাদের বীণা শুনাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, আমরা বেলা ১টার সময় আসিয়া দেখিলাম ৮।১০ বৎসরের বালিকা হইতে ২০।২২ বৎসরের রমণীগণ আসিয়া বীণা বাদ্য ও গান শিক্ষা করিতেছেন। আমরা ভিন্ন শ্রেণীর বালিকাগণের বীণা বাদ্য ও গান শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম।

প্রথমে দুইটী বালিকা লইয়া এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এইক্ষণে ৬০০ শত বালিকা বিনা বেতনে শিক্ষা পাইতেছেন। ২৲ টাকা হইতে ১০৲টাকা পর্য্যন্ত কয়েকটী মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। রাজসরকারের গাড়ী করিয়া বালিকাদিগকে স্কুলে আনা হইয়া থাকে।

এই বালিকা-বিদ্যালয়টী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নরসিংহ আয়াঙ্গার মহাশয়ের বিশেষ যত্নে উন্নতি লাভ করিয়াছে। অতঃপর আমরা মোরিমল্লাপ্পা নামক হাইস্কুল দেখিতে যাই। স্কুলটী দেওয়ান বাটীর সন্নিকট, মৃত রাজদরবার বক্সী মরিমাল্লপ্পা কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া উক্ত নামে স্কুলের নামকরণ হইয়াছে। বাটীটি বৃহৎ এবং দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ১২০ ফুট হইবে; উহার প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে নানাবিধ পুষ্প ও লতা সকল সুশোভিত রহিয়াছে। এই বাটীটি ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মোরিমল্লাপ্পা হাইস্কুলের পূর্ব্বদিকে নরসিংহন্না সংস্কৃত বিদ্যালয় বাটী, নরসিংহন্না নামে কোন কাষ্ঠবিক্রেতা ১২ বার হাজার

টাকা ব্যয়ে এই বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। উহা দৈর্ঘ্যে ৮০ ফুট প্রস্থে ৬০ ফুট ; অনেকগুলি বালক এই স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষা পাইয়া থাকে।

মহিসুরে অনেকগুলি নূতন বাটী ও রথ্যা প্রস্তুত হইতেছে ও হইয়াছে। নূতন দেওয়ান-আফিস ও জেনেরল হস্পিটাল্ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। একটি বৃহৎ বাজার স্থাপিত হইতেছে। মহিসুর একটি আদর্শ করদরাজ্য, রাজস্ব ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে, গত পূর্ব্ব বৎসর ১৩০ লক্ষ টাকা আয় ছিল ; গত বৎসর হইতে ১৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা আয় হইয়াছে।

শ্রীরঙ্গপত্তন।

১৮৯০ সালে ১৭ই জুন মঙ্গলবার প্রাতে ৭।৩০ মিনিটের ট্রেণে মহিসুর হইতে যাত্রা করিয়া ৮।১০ মিনিটের সময় শ্রীরঙ্গ-পত্তনে পৌঁছিলাম। এই স্থানের আমিলদার ও এপথিক্যারি, আমাদিগের জন্য রেলষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। গাড়ী আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহারা সমাদরের সহিত আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন; এবং আমাদের সময় অল্প জানিয়া এই স্থানের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থান সকল দেখাইবার নিমিত্ত সত্বরে লইয়া গেলেন। আমরা এখানে পুণ্যভূমি শ্রীরঙ্গপত্তনের পুরাবৃত্ত কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব।

শ্রীরঙ্গপত্তন কাবেরীনদীর চরদ্বীপ; ইহা দীর্ঘে প্রায় ৩ মাইল, প্রস্থে ১॥০ মাইল এবং সমুদ্র সমতল হইতে ২৩৩৪ ফুট উচ্চ হইবে। ত্রিশিরাপল্লীর সন্নিকটে কাবেরী নদীর যে চরদ্বীপ আছে তাহার নাম অন্তরঙ্গ এবং ইহা আদিরঙ্গ নামে বিখ্যাত।

শ্রীরঙ্গপত্তনের ঐতিহাসিক বিবরণ নাই। কেহ কেহ মনে করেন, এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই চরদ্বীপ জঙ্গলময় ছিল। অতি পুরাকালে এই চরদ্বীপ হোসহল্লী এবং অল্লারহল্লী নামে দুইটি পল্লী ছিল। গৌতম মহামুনির তিম্মন্ন নামক জনৈক শিষ্য

অঙ্গারহল্লী পল্লীস্থ কোন অঙ্গারবৃক্ষের নিকট বৃহৎ বল্মীক স্তূপের ভিতর শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন; তিনি উক্ত মূর্ত্তির উপর মূলস্থান বা গর্ভগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া পূজার বন্দোবস্ত করেন। ৮৯৪ খৃঃ এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎকালে বল্লালবংশীয় রাজগণ যাদবপুরীতে থাকিয়া শ্রীরঙ্গপত্তনাদি শাসন করিতেন। তাঁহারা জৈনমতাবলম্বী ছিলেন। ১০৫০ খৃঃ বিশিষ্টাদ্বৈত মত-প্রবর্ত্তক বিখ্যাত রামানুজাচার্য্য করিকাল চোলের ভয়ে যাদব-পুরীর বল্লাল রাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, মন্ত্রবলে রাজকন্যাকে ব্রহ্মদৈত্য হইতে রক্ষা করায় রাজা তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুবর্দ্ধন নাম গ্রহণ করেন। আচার্য্য শিষ্যদিগকে কাবেরীর চরভূমি দেবসেবার নিমিত্ত অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উক্ত চরভূমি চারিশত বৎসর ভোগ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত তিম্মন্ন স্থাপিত শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীকে আশ্রয় করিয়া বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে এবং ক্রমে উহা সামান্য পল্লী হইতে একটি সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হয়। শ্রীরঙ্গস্বামীর নাম হইতেই সমস্ত চরভূমি শ্রীরঙ্গপত্তন নামে অভিহিত হইতেছে। ১৫৩০ খৃঃ বিজয়নগরের সুবিখ্যাত রাজা কৃষ্ণরায়ালু শ্রীরঙ্গপত্তন আপন অধিকার ভুক্ত করিয়া প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহা-দিগের শাসনকালে প্রথম দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৫৬৪ খৃঃ বিজয়নগরের রাজা রামরায়ালু বিজাপুরের সুলতান্ কর্ত্তৃক পরা-ভূত হইলে ও বিজয়নগর তাহাদিগের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও

শ্রীরঙ্গপত্তনের রাজপ্রতিনিধিগণ ১৬১০ খৃঃ পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তথাকার শেষ শাসনকর্ত্তা তিরুমল রায়ালু ওরফে শ্রীরঙ্গরায়ালু, আপন কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়, বৃদ্ধাবস্থায় রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ তালকদ্ নামক স্থানে যাইয়া অতিবাহিত করেন; এই সুযোগে মহিসুরের উদৈয়ার রাজা শ্রীরঙ্গপত্তনের চরভূমি আপন অধিকারভুক্ত করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। তৎকালে তিনি বত্রিশটি পল্লীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

১৬১৮ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যু হইলে চামরাজ উদৈয়ার রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। তিনি দুর্গের জীর্ণ-সংস্কার, রাজ্যবিস্তার ও শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর মন্দিরের উন্নতি করিয়াছিলেন।

১৬৩৮ খৃঃ কান্তিরব-নরাশ রাজা হইয়া দুর্গের অনেক উন্নতি-সাধন, নরসিংহ স্বামীর মন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা এবং নূতন রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ চণ্ডী-উপাসক ছিলেন, কিন্তু তিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হন। বিজাপুরের আদিলশাহি-বংশীয় সুলতানের সেনানায়ক রঙ্গদুলাল খাঁ শ্রীরঙ্গ-পত্তন আক্রমণ করিতে আইসেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নরাশরাজ অপরিসীম সাহসী ছিলেন; তিনি মধ্যগিরি, হস্‌সান্, বেল্লুর, উস্‌হুর, বেঙ্গলুর প্রভৃতি প্রদেশ কয়েকটি আপন অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্ত্তাকে পরাভূত করিয়া-ছিলেন।

১৬৫৯ খৃঃ দদ্দদেব উদৈয়ার পিতৃপদে অভিষিক্ত হন, ইনিও রাজ্যের অনেক সুবন্দোবস্ত ও উন্নতি করেন।

১৬৭০ খৃঃ চিক্কদেব উদৈয়ার রাজপদ গ্রহণ করেন, তিনি অতিশয় সাহসী পুরুষ ছিলেন। এক দিবসে নয়টি দুর্গ অধিকার করিয়া এত রত্ন পাইয়াছিলেন যে নবকোটিনারায়ণ নামে খ্যাত হইতেন। তিনি কদুর ও বস্তার নামক স্থান আপন রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৬৯০ খৃঃ চিক্কসাগর-নালা নামক জলসেচন-খাত খনন ও কাবেরীর দক্ষিণ শাখার উপর সেতু নির্ম্মাণ করেন এবং দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে জগদ্দেব উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, ১৬৯৮ খৃঃ মহারাষ্ট্রীয় বাহিনীনায়ক ঘট্‌কে শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করিতে আসিলে দলবায়পুত্র দেবৈরা তাঁহাকে পরাভূত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য করেন। ১৭০৪ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়, মধুরাপুরীতে তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটী গল্প আছে; মঙ্গলমার মৃত্যুর পূর্ব্বে দণ্ডধরের অনুচরেরা শ্রীরঙ্গপত্তনের কোন এক ব্যক্তিকে ভুলক্রমে যমপুরীতে লইয়া যায়, কিন্তু চিত্রগুপ্তের হিসাবে তাহা প্রকাশ পাইলে দণ্ডধরের আজ্ঞায় সে ব্যক্তিকে শ্রীরঙ্গপত্তনে পুনর্ব্বার পাঠাইয়া দেওয়া হয়; চিক্কদেবরাজ তৎকালে যমপুরীতে বাস করিতেছিলেন, তিনি উক্ত ব্যক্তির দ্বারা সংবাদ দেন যে তিনি ধন সঞ্চয় করিয়া একটি নিভৃত কক্ষে রাখিয়া আসিয়াছেন, কোন সৎকার্য্যে ব্যবহার করেন নাই, সেই নিমিত্ত নরক-যন্ত্রণাভোগ করিতেছেন; আর মধুরাপুরীর মঙ্গলমা সদ্ব্যয় করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার মৃত্যুকাল সন্নিকট হওয়ায়

তাঁহাকে সমাদরে স্বর্গে লইয়া আসিবার কারণ রথের বন্দোবস্ত হইয়াছে; অতএব আমার হাবা পুত্র ও বিশ্বাসী দলবায়কে কহিবে গুপ্তধন লইয়া আমার উদ্ধারের জন্য ব্যয় করেন, এইরূপ বলিয়া, মঙ্গলমার মৃত্যুর সময় ও নিভৃত ধনের নিদর্শন বলিয়া দেন। সে ব্যক্তিও মৃত রাজাজ্ঞাপালন করিয়া দলবায়কে সমস্ত কহিয়াছিলেন, ও কথিত আছে যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মঙ্গলমার মৃত্যু হইয়াছিল। চিক্কদেবের পুত্র কান্তিরব উদৈয়ার হাবা কালা হইলেও দলবায় তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া তাঁহার নামে বার বৎসর রাজ্যশাসন করেন। তৎপরে দদ্দ-কৃষ্ণ উদৈয়ার ১৭১৬ হইতে ১৭৩৩ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; তাঁহার সময়ে দলবায় দেবরাজ অর্স রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। ১৭৩৩ হইতে ১৭৩৬ খৃঃ পর্য্যন্ত চামরাজ উদৈয়ার নামে রাজা ছিলেন, দলবায় দেবরাজ অর্সই পূর্ব্বমত সমস্ত রাজকার্য্য করিতেন। অধিকন্তু তিনি রাজার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন, পরে কোপলদ্রুগ নামক স্থানে অনেক যন্ত্রণা দিয়া নিহত করেন; ও তৎপরে চিক্ক-কৃষ্ণ উদৈয়ারকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করেন ও আপন কনিষ্ঠ নন্দরাজ-অর্সকে সর্ব্বাধিকার (প্রধান সেনাপতির) পদে নিযুক্ত করিয়া উভয়ে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন। ১৭৫৭ খৃঃ বালাজীরাও পেশোয়া শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করিয়া দলবায় দেবরাজ-অর্সকে পরাভূত করণানন্তর একটি জেলা কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

১৭৬১খৃঃ, সর্ব্বাধিকার নন্দরাজ-অর্স দিন্দিগুল ও দেবনহল্লী দুর্গদ্বয় মহিস্থর রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। ইহার পর হাইদার-আলিখাঁ বাহাদুরের সহিত তাঁহার মনান্তর উপস্থিত হইয়াছিল।

হাইদার-আলি কোলার নামক স্থানে মেষপালকের কার্য্য করিতেন, পরে সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বাধিকার নন্দরাজ-অর্সের অধীনে সামান্য অশ্বারোহীর কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। দেবনহল্লী দখলের সময় হাইদার-আলি আপন ক্ষমতা ও বীরত্ব প্রকাশ করিলে ক্রমে অশ্বারোহীর দলপতির পদ প্রাপ্ত হয়েন, পরে অপর কয়েকটি দুর্গ অধিকার করিলে বেঙ্গলুর প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তথাকার দুর্গ সংস্কার করিয়া আপন ক্ষমতা দৃঢ়ীভূত করিতে আরম্ভ করিলে, সর্ব্বাধিকার নন্দ-রাজ ও মন্ত্রী খাণ্ডেরাওর বিষনয়নে পতিত হন। তাঁহারা তাঁহার নিধনের ষড়যন্ত্র করিয়া গুপ্তচর পাঠাইলে হাইদার-আলি তাহা জানিতে পারিয়া, গোপনে শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে বাহির হইয়া ছদ্মবেশে পথ অতিবাহিত করিয়া বেঙ্গলুরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎপরে আপন অধীনস্থ সমস্ত পদাতি ও অশ্বারোহী সেনা একত্র করিয়া মন্ত্রী বালাজীরাও ও দলবায় দেবরাজ-অর্সের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করিয়া তাঁহাদের উভয়কে বন্দী করেন। বৃদ্ধ চিক্ক-কৃষ্ণ উদৈয়ারকে নজরবন্দী করিয়া তাঁহার নামে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ১৭৬১ খৃঃ এই ঘটনা হইয়াছিল।

১৭৬৬ খৃঃ বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইলে, হাইদার-আলি রাজ-

কুমার নন্দ উদৈয়ারকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পিতার ন্যায় নজরবন্দীতে রাখেন। এই অদূরদর্শী বন্দীরাজা, কোন দুষ্ট লোকের পরামর্শে হাইদার-আলির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হইলে হাইদার-আলি তাহা অবগত হইয়া বন্দী রাজাকে নিহত করিয়া, তাঁহার ভ্রাতা চামরাজ উদৈয়ারকে ১৭৭১ খৃঃ তৎপদে অভিষিক্ত করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই মহারাষ্ট্রীয় সেনানায়ক তিম্বরাও-মন্নর মহিসুর প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিল। শ্রীরঙ্গপত্তনের ১২ মাইল দূরে চির্কুলি নামক স্থানে হাইদার-আলিকে পরাভূত করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করিলে, হাইদার-আলি তাহাকে বহুসংখ্যক নগদটাকা ও রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৭৭৫ খৃঃ উক্ত চামরাজের মৃত্যু হয়; তাঁহার কোন সন্তানাদি না থাকায় হাইদার-আলি সমস্ত রাজবংশীয় বালকদিগকে দরবার গৃহে একত্র করিয়াছিলেন, পূর্ব্বেই সেই গৃহে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী ফল, মূল, খেলনা ও অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়াছিলেন; বালকদিগকে তথায় ছাড়িয়া দিয়া তাহারা কি করে তাহা আপনি দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন তন্মধ্যে অধিকাংশ বালকই মিষ্টান্ন খাইতে লাগিল, কতকগুলি বালক খেলনা লইয়া খেলা করিতে লাগিল, কেবল চামনামে একটি বালক দক্ষিণহস্তে একখানি উজ্জ্বল তরবারি লইয়া এবং বামহস্তে একটি লেবু উঠাইয়া লইয়া দেখিতে থাকিলে হাইদার-আলি ঐ বালককে রাজ্যোপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

১৭৮০ খৃঃ হাইদার-আলি কাঞ্চীপুরের নিকট কর্ণেল বেলি সাহেবকে আক্রমণ করিয়াছিলেন; বেলি সাহেব অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর পরাস্ত হইয়া, ২৪ জন ইংরেজ অফিসার ও ৪১৭ জন গোরা সৈন্যের সহিত বন্দীরূপে শ্রীরঙ্গপত্তনে নীত হয়েন। পরে ১৭৮৪ খৃঃ সন্ধিতে তাঁহারা মুক্তি পাইয়াছিলেন।

হাইদার-আলি পৃষ্ঠব্রণে অনেক দিন কষ্ট পাইতেছিলেন। ১৭৮২ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাহার প্রথম পুত্র টিপু সুলতান্ তাঁহার পদে অভিষিক্ত হয়েন।

১৭৪০ খৃঃ দেবনহল্লী নগরে টিপু জন্মগ্রহণ করেন। অরু-কড় নিবাসী টিপু আলিয়ার নামক কোন সিদ্ধপুরুষের নাম হইতে হাইদার-আলি আপন পুত্রের নাম টিপু রাখিয়াছিলেন।

টিপুর স্বভাব অতি ক্রূর ছিল, রাজ্যাভিষিক্ত হইবার পরই চামরাজ উদৈয়ারকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন এবং তাঁহার প্রতি অযথা অত্যাচার করিতে ক্রটি করেন নাই।

টিপু সুলতান শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গের পুনঃসংস্কার করেন। তৃতীয় র্যামপার্ট দেওয়ালটী প্রস্তুত হইলে চতুর্থ র্যামপার্ট দেওয়াল প্রস্তুত করিয়া দুর্গের চারিদিকে কামান বসান; তৎ-পরে মহিসুর রাজবাটী ভাঙ্গিয়া সেই মাল মসলাতে শ্রীরঙ্গপত্তনে আপন রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

১৭৮২ খৃঃ ১৭ ফেব্রুয়ারী তারিখে কোলরুণতীরস্থ পাস্ত-কোরে কর্ণেল ব্রেট্ওয়েটের সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করেন ও শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন।

১৭৮৪ খৃঃ নানা কারণ বশতঃ তিনি ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হয়েন, উহা মাঙ্গলোর-সন্ধি বলিয়া খ্যাত এবং সেই সন্ধিতে সমস্ত ইংরাজসেনা ও কর্ম্মচারী মুক্ত হইয়াছিল।

১৭৯২ খৃঃ লর্ড কর্ণওয়ালিশ সসৈন্যে আসিয়া শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিয়াছিলেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ইংরাজবাহিনী এখানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ৭ই তারিখের যুদ্ধে টিপু পরাজিত হয়; ঐ তারিখে সন্ধ্যার সময় ইংরাজসেনা ৭২টী তোপের সহিত গঞ্জাম সহর দখল করিয়া লইলে ৮ই তারিখে টিপুসুলতান আপন সৈন্য সমস্ত দুর্গের ভিতর আনয়ন করেন এবং সতর্কের সহিত দুর্গ রক্ষা করিতে থাকেন। ২৪শে তারিখে বেগতিক দেখিয়া টিপু সন্ধির প্রার্থনা করিয়া পাঠান; সেই সন্ধিতে তিনি ইংরাজরাজকে তিন ক্রোর ত্রিশলক্ষ টাকা ও অর্দ্ধেক রাজ্য দিতে বাধ্য হয়েন। ২৬শে তারিখে সন্ধিপূরণের জামীন স্বরূপ আপন দুই পুত্রকে লর্ড কর্ণওয়ালিশ সাহেবের নিকট পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পুত্র দুইটীর মধ্যে বড়টীর নাম আব্দুল খলিফ বয়স দশ বৎসর, ছোটটীর নাম মৈজুদ্দীন বয়স ৮ বৎসর। সুলতানের পুত্রদ্বয় ইংরাজরাজ প্রতিনিধির তাঁবুতে পৌঁছিলে লর্ড কর্ণ-ওয়ালিশ তাহাদিগকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া আপনার পার্শ্বে স্থান দিয়া বসাইয়াছিলেন, তৎপরে টিপু সুলতানের উকীল গোলাম আলিসাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিশের সম্মুখে করযোড়ে কহিলেন; মহারাজ! এই দুইটী বালক আমার প্রভু সুলতান

সাহেবের সন্তান। অদ্য প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত পিতৃযত্নে পালিত হইতেছিল, এখন তাঁহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; উহারা এখন হইতে আপনাকে পিতা বলিয়া জানিবে। লর্ড কর্ণওয়ালিশ উক্ত সুলতান-পুত্রদ্বয়কে রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহাদিগকে উত্তর অরুকড়ুর অন্তর্গত বেলুরের দুর্গে প্রেরণ করেন, পরে কলিকাতা রাজধানিস্থ টালিগঞ্জ নামক স্থানে তাঁহাদের বাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন ; তাঁহাদের বংশধরেরা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন ও নবাব নামে খ্যাত হইতেছেন।

এই সন্ধির পর হইতে ১৭৯৯ খৃঃ পর্য্যন্ত সুলতান, আপন ক্ষতিপূরণের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। য়ুরোপে ফরাসী বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় নেপোলিয়ন বোনাপার্ট য়ুরোপে তুমূল হুলস্থূল বাধাইয়া দেন। কুক্ষণে ইংরেজরাজের অজ্ঞাতে টিপু তাঁহার নিকট আপন বাহিনী সুশিক্ষার কারণ ফরাসী রণসচিব চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর্ এই সংবাদ অবগত হইয়া সন্ধিচ্যুত করেন, টিপুসুলতানের বিরুদ্ধে গবর্ণর জেনারেলকে যুদ্ধযাত্রা ঘোষণা করিতে আদেশপত্র পাঠান। গবর্ণর জেনারেল কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরদিগের অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইবা মাত্র, জেনারেল হেরিশ সাহেবকে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ দেন।

জেনারেল হেরিশ ইতিপূর্ব্বে ৬ই মার্চ্চ তারিখে বেলুর হইতে রওনা হইয়াছিলেন। ২৬শে মার্চ্চ তারিখে টিপুসুলতান

মলবল্লির নিকট জেনারেল হেরিশের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, এইখানে এক তুমুল সংগ্রাম হইয়া যায়, তাহাতে টিপুর অনেকগুলি দক্ষ ও সাহসী সর্দ্দার নিহত হইয়াছিল। টিপু-সুলতান পরাজিত হইয়া আপন রাজধানী অভিমুখে পলায়ন করেন। ৩০শে মার্চ্চ তারিখে জেনারেল হেরিশ কাবেরী পার হইয়া শ্রীরঙ্গপত্তনের দক্ষিণ ভাগে স-সিলী নামক স্থানে ছাউনি স্থাপন করেন ৫ই এপ্রেল রাত্রে কর্ণেল ওয়েলেস্‌লি সুলতান-পেট আক্রমণ করেন ও ৬ই তারিখে দুর্গের উপর কামান ছুঁড়িতে থাকেন।

৯ই এপ্রেল তারিখে টিপুসুলতান জেনারেল হেরিশকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন যে, তিনি সন্ধিস্থাপন করিতে প্রস্তুত আছেন।

২০শে এপ্রেল তারিখে জেনারেল হেরিশ বঙ্গার দিদ্দীলি নালার সন্নিকটস্থ প্রাকার অধিকার করেন।

২৪শে এপ্রেল জেনারেল হেরিশ টিপুসুলতানকে সন্ধি প্রস্তাবের খসড়া পাঠাইয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত খসড়ার প্রত্যুত্তর চাহিলেন, কিন্তু ঠিক সময়ে প্রত্যুত্তর না আসিলে, ২৬শে তারিখে বঙ্গার দিদ্দিলা নালার উত্তরদিকের প্রাকার অধিকার করিয়া লয়েন। ২৮শে তারিখে টিপুসুলতান জেনারেল হেরিশকে পুনরায় এই লিখেন যে তিনি সন্ধিস্থাপনের কারন দুইজন উকীল পাঠাইবেন।

৪ঠা মে তারিখে বেলা ১২ বারটার সময়ে মেজর জেনারেল বেয়ার্ড প্রথমে শ্রীরঙ্গপত্তনের কেল্লা আক্রমণ করেন, এই সময়ে

গোলন্দাজ সৈন্যাধ্যক্ষ সৈয়দ আবদুল গফুর আট হাজার গোলন্দাজ সেনা লইয়া দুর্গ রক্ষা করিতে ছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ একটা গুলির আঘাতে তিনি নিহত হইলে, সুলতানের সমস্ত সেনা ভয়ে ছোড়ভঙ্গ হইয়া পড়ে। সুলতান আহার করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার নিকট এই কুসংবাদ পৌছিলে অতি সত্বর আহার সমাধা করিয়া স্বয়ং যুদ্ধার্থে বাহির হইয়া রাজবাটীর পূর্ব্বদিকে হোলিদিদ্দিলী নামক ছোট দরজা দিয়া বাহির হইয়া র‍্যামপার্টের উপর দিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলেন। কিন্তু গোলা দ্বারা ভগ্ন দেওয়ালের (র‍্যামপার্ট্য নিকট) পৌছিয়া দেখিলেন, তাঁহার সমস্ত সৈন্য হটিয়া আসিতেছে, তখন সে অবস্থায় ইংরেজদিগকে বাধা দিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে মনে করিয়া ভিতরের র‍্যামপার্টে গিয়া তথা হইতে ইংরেজদিগকে বাধা দিবার অভিপ্রায়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দরজার নিকট আসিয়া দেখেন দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। এদিকে যখন সৈয়দ আবদুল গফুরের মৃত্যু হয়, তখন জেনারেল বেয়ার্ড আপন সৈন্যদিগকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া একদল দক্ষিণদিকে আর একদল বামদিকের র‍্যামপার্টে পাঠান। টিপুসুলতান বামদিকের দেওয়াল হইয়া আসিতেছিলেন, তথায় ইংরেজসৈন্য দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দক্ষিণ দিক্ দিয়া যে সকল ইংরেজসৈন্য আসিয়াছিল, তাহারা আসিতে আসিতে দেখিতে পাইল বাহিরের র‍্যামপার্ট হইতে ভিতরের র‍্যামপার্টে আসিবার জন্য একখানি তক্তা লাগান

আছে, তাহার সাহায্যে একটী একটী করিয়া সকল সৈন্য ভিতর র‍্যামপার্টে আসিতে লাগিল। টিপু যে সময়ে দরজার নিকট আসিয়া পৌঁছেন তৎকালে দক্ষিণ দিকস্থ ইংরেজসেনা সেই দরজার র‍্যামপার্টের নিকট পৌঁছিয়াছিল। সুতরাং টিপু-সুলতান সম্মুখে ও পশ্চাতে ইংরেজসেনা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সামান্য সৈনিকের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে কালের করাল-কবলে পতিত হয়েন। তাঁহার অন্যান্য সৈনিকেরা আলামসজি-দের ভিতর যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, জেনারেল বেয়ার্ড তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া মসজিদের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করেন এবং তৎপরে মেজর এলেন্ দ্বারা রাজবাটীতে সংবাদ পাঠান যে, যদি সকল রাজপরিবার তাঁহার বশে আসেন, তবে তাঁহাদের জীবন রক্ষা হইবে। সেই সংবাদে রাজবাটীর সুলতান পরিবারেরা তাঁহার বশে আসিলে টিপুসুলতানকে পাওয়া গেলনা, তখন চারিদিকে অন্বেষণ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ব্বোক্ত হোলিদিদ্দিলী বগালু দ্বারের নিকট অন্যান্য মৃত সৈন্যদিগের মধ্যে সুলতান সাহেবের মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছিল। তখন জেনারেল বেয়ার্ড সুলতানের মৃতদেহ রাজভবনে প্রেরণ করেন। পর দিবস প্রাতে সমারোহের সহিত লালবাগ নামক স্থানে সুলতানের সমাধি হইয়াছিল।

১৭৮৪ খৃঃ, টিপু উক্ত লালবাগ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; পিতা, মাতা ও আপনি নিজে তথায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন।

এই জেনারেল বেয়ার্ড ১৭৮০ খৃঃ টিপু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অন্যান্য ইংরেজ সৈনিকদিগের সহিত শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গের ভিতরে চারি বৎসর বন্দীরূপে ছিলেন ; এক্ষণে লোকে দেখান, যে স্থানে টিপুসুলতান সমরে পতিত হইয়াছিলেন, তথা হইতে এক হাজার ফুটের মধ্যে বেয়ার্ড সাহেবের কারাগৃহ ছিল। টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর মেজার এলেন রাজপুরী হইতে টিপুর পুত্রদিগকে জেনারেল সাহেবের নিকট আনয়ন করিলে, জেনারেল সাহেব আপন পূর্ব্ব অবস্থা বিস্মৃত হইয়া মহৎ লোকের মত রাজপুত্রদিগকে আদরের সহিত গ্রহণ করেন ও তাহাদের অভয় দিয়া কহেন যে, কেহ তাহাদিগের উপর অত্যাচার করিবে না। তৎপরে রাজপুত্রদিগকে হেড্‌কোয়া-টার ক্যাম্পে লইয়া যাইবার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া দেন, আর যৎকালে তাঁহারা ইংরেজ সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁবুতে যাইতেছিলেন, তৎকালে ইংরেজবাহিনী সম্মান চিহ্নস্বরূপ অস্ত্র বাড়াইয়াছিল।

১৭৯৫ খৃঃ বন্দী বৃদ্ধ চামরাজ উদৈয়ারের বসন্তরোগে মৃত্যু হইলে, টিপু সুলতান রাজবাটী লুট করিয়া সমস্ত রাণীদিগকে বন্দী করিয়া রাখেন। টিপু সুলতান জানিত না যে রাণীদিগের নিকট একটী দুই বৎসরের শিশু জীবিত ছিল, টিপুসুলতান তাহা জানিতে পারিলে অবশ্যই তাহাকে বধ করিয়া ফেলিত। মন্ত্রিবর পূর্ণিয়ার সাহায্যে বিধবা রাণী রাজপুত্রকে লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। টিপু সুলতানের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত

সেই বালক রাণীদিগের নিকট গুপ্তভাবে বন্দী অবস্থায় ছিল; টিপুর মৃত্যুর পরদিবস পূর্ণিয়া উক্ত রাজপুত্রকে লইয়া জেনারেল হেরিশের তাঁবুতে উপস্থিত হয়েন, ও সেই রাজপুত্রই যে হিন্দু-রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী এই বলিয়া পরিচয় দেন। জেনারেল হেরিশও তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া, সেই রাজকুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন ও পূর্ণিয়াকে মন্ত্রিত্বে বরণ করেন। এই মন্ত্রী পূর্ণিয়া হইতে মহিসুর-হিন্দুরাজ-বংশের পুনরুদ্ধার বলিতে হইবেক। এই রাজার নাম মহারাজ কৃষ্ণরায়ালু উদৈয়ার বাহাদুর। পূর্ণিয়া শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে রাজধানী মহিসুরে উঠাইয়া লইয়া যান এবং টিপুসুলতানের রাজবাটী ধ্বংস করিয়া সেই মাল মসলাতে মহিসুররাজ কৃষ্ণরায়ালু উদৈয়ার বাহাদুরের রাজবাটী নির্ম্মাণ করেন। ১৮১০ খৃঃ উক্ত মহারাজ সাবালক হইয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ণিয়া অবসর গ্রহণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিন শ্রীরঙ্গপত্তনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দশ বৎসর মন্ত্রিত্বকালে রাজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। তিনি যে এক অসাধারণ গুণসম্পন্ন উদ্যমশীল রাজপুরুষ ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। এখন যে মহিসুররাজ্য সুখসমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, তাঁহাকেই ইহার মূলাধার বলিতে হইবেক।

১৭৬১ খৃঃ হইতে ১৭৯৯ খৃঃ পর্য্যন্ত হাইদার-আলি ও তাঁহার পুত্র টিপুসুলতান মহিসুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শ্রীরঙ্গপত্তনের পুরাবৃত্ত ইংরাজী অনভিজ্ঞ পাঠকদিগের

জন্য দেওয়া হইল। অতঃপর আমরা যাহা যাহা দেখিয়াছি তাহার বিবরণ সংক্ষেপে লিখিতেছি।

১ম। টিপুসুলতানের বৃহৎ রাজবাটীর দালানের ভগ্নাবশিষ্ট একাংশ মাত্র রহিয়াছে; উহার খিলান সকল গাঁথাইয়া, উহা এক্ষণে চন্দনকাষ্ঠের গুদামরূপে পরিণত হইয়াছে।

২য়। হোলিদিদ্দিলী বগালু নামক গুপ্তদ্বারের নিকট যাইলাম। এইস্থানে টিপুসুলতান যুদ্ধ করিতে করিতে কালের করালকবলে পতিত হইয়াছিলেন। ইহার নিকট গঙ্গাধর স্বামীর মন্দির। এই মন্দিরের ব্যয়-কারণ মহিসুর-রাজসরকার হইতে বাৎসরিক দুই হাজার ছাব্বিশ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। এই মন্দিরের নিকট ভূতপূর্ব্ব রাজা একটি ছোট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

৩য়। এখান হইতে 'আলা' মসজিদ্ দেখিতে যাই। ইহা গঞ্জমগেটের নিকট টিপু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, পূর্ব্বে এই স্থানে আঞ্জনেয়দেবের মন্দির ছিল।

যৎকালে হাইদার-আলি, প্রধান সৈনিক নন্দরাজ আর্সের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত বেঙ্গলুরে পলায়ন করেন; সেই সময়ে নন্দরাজ আর্স টিপু এবং তাঁহার মাতাকে এইস্থানে নজরবন্দী করিয়া রাখেন। তখন টিপু সাত বৎসরের বালক মাত্র। টিপু হিন্দুবালকদিগের সহিত ঐ দেবালয়ের অঙ্গনে খেলা করিত। এক দিবস কোন এক ফকির সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে টিপুকে দেখিয়া চমকিয়া দাঁড়াইয়া সম্বোধন

করিয়া কহিল ; যখন তুমি এই দেশের রাজা হইবে, এই হিন্দু-দেবালয় ভাঙ্গিয়া উহার উপর মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিবে, তাহা হইলে ঐ কীর্ত্তি তোমার স্মরণ চিহ্নস্বরূপ থাকিবে ও ভবিষ্যতে সকলেই তোমার সম্মান করিবে। টিপু তৎশ্রবণে হাসিতে হাসিতে সেই ফকিরকে কহিয়াছিল আপনার আশীর্ব্বাদে যদি রাজা হইতে পারি, তবে আপনার আদেশ অবশ্য পালন করিব। বলা বাহুল্য, টিপু রাজা হইলে উক্ত হিন্দুদেবালয় ধ্বংস করিয়া তদুপরি উক্ত 'আলা'মসজিদ্ নির্ম্মাণ করেন। ১৭৯০ খৃঃ ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়।

ইহার গঠনপ্রণালী অতি উত্তম। দিল্লীর জুম্বা মস্‌জিদের মত উৎকৃষ্ট না হইলেও দেখিবার যোগ্য বটে। জুম্বা মস্‌জিদ শুভ্র মার্ব্বলে নির্ম্মিত এবং আলা মস্‌জিদ হিন্দুদেবালয়ের ধ্বংসাবশিষ্ট মালমসলায় নির্ম্মিত হইয়াছে। মস্‌জিদের দেওয়া-লের পঙ্কের কাজ অতি উত্তম। আমরা উহা দেখিতে দেখিতে ভাবিয়াছিলাম কোথায় বা সেই আঞ্জনেয় দেবের হিন্দুমন্দির, আর কোথায় বা সেই শ্রীরঙ্গপত্তনের টিপুসুলতান। এই মস্‌জিদ উক্ত স্মৃতি জাগরূক করিয়া দিতেছে ; ইহাও একদিন কালের বশে ধ্বংশ হইবে। এই সংসার সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। পরম প্রভু পরমেশ্বরের নাম করিতে করিতে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গঞ্জম অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

৪র্থ। গঞ্জম শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গ হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এইস্থান পূর্ব্বে টিপুর সময়ে সমৃদ্ধিশালী সহর ছিল, এবং অন্ততঃ

ত্রিশহাজার লোক বাস করিত। কিন্তু এক্ষণে ইহা একটী পল্লীতে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। বোধ হয় দুইহাজার লোকের বাসের অধিক নাই। আমরা তথা হইতে লালবাগ নামক বাগানে হাইদার আলি তৎপত্নী, ও তাঁহার পুত্র টিপুসুলতানের সমাধি দেখিতে যাইলাম। এই মসজিদ্ ১৭৮৪ খৃঃ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা প্রকাণ্ড সমচতুর্ব্বাহুবিশিষ্ট জমকালো সেরাসনিক অনুকরণে নির্ম্মিত; ইহার থাম সকল সিমগার অন্তর্গত তরুবেকেরের কাল প্রস্তরে নির্ম্মিত। উপরের ডোম ও চূড়ার গঠন অতি উত্তম। ইহার দরজা চন্দনকাষ্ঠে নির্ম্মিত এবং তাহার উপর হস্তিদন্তের সুচারু কার্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৮৫৫ খৃঃ লর্ড ডেলহাউস ইহা দেখিতে আসেন, তখন দরজার অবস্থা বড়ভাল ছিল না; তাঁহার অনুমতিক্রমে পূর্ব্ববৎ নূতন দরজা প্রস্তুত হইয়াছে। মেওসোলিয়মের সন্নিকটে নেমাজ পড়িবার মসজিদ্ আছে ও অপরদিকে ফকিরদিগের থাকিবার আশ্রম আছে। প্রত্যহ হিন্দু মুসলমান গরীব আগন্তুক সমভাবে অর্দ্ধসের আটা পাইয়া থাকে, দূর হইতে ফকির বা হিন্দুভিক্ষার্থী আসিলে দুই আনা হিসাবে দেওয়া হয়। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মহিসুররাজ হইতে মাসিক সাতশত টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার উদ্যান প্রশস্ত, উত্তম উত্তম ফল ও ফুল বৃক্ষে সুশোভিত, রাস্তাও বেশ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন।

৫ম। আমরা তথা হইতে বেলি সাহেবের সমাধি দেখিতে যাইলাম। ইহা মেওসেলিয়মের বাহিরের সন্নিকটে একটি

সামান্য প্রাঙ্গণ মধ্যে অবস্থিত। ১৭৮০ খৃঃ জানুয়ারী মাসে বেলি সাহেব শ্রীরঙ্গপত্তনে আসিয়া পৌঁছেন। ১৭৮২ খৃঃ ১৩ই নবেম্বর তারিখে বন্দী অবস্থাতেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ এই স্তম্ভ তাঁহার সমাধির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যখন তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র কর্ণেল বেলি লক্ষ্ণৌসহরের রেসিডেন্ট ছিলেন, তৎকালে তাঁহারই ব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

৬। আমরা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দরিয়া-দৌলৎ-বাগ নামক টিপুর প্রমোদোদ্যান দেখিতে যাইলাম। ইহা দুর্গের বহির্ভাগে মহানবমী মণ্ডপের উপর ১৭৮৪ খৃঃ টিপু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি ইহাতে গ্রীষ্মকালে বাস করিতেন বলিয়া ইহা গ্রীষ্মভবন নামে প্রসিদ্ধ হইতেছে। ইহার তিন দেওয়ালে কর্ণেল বেলির সহিত পল্লীলোরে হাইদার আলির ও টিপুর যুদ্ধের চিত্র আছে। টিপুর মৃত্যুর পর কর্ণেল ওয়েলেস্‌লি এই বাটীতে দুই বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন। ইহার উদ্যান প্রশস্ত ও নানাবিধ ফলফুলে সুশোভিত। লর্ড ডেলহাউসের অনুমতিক্রমে এই প্রমোদ ভবনের পুনঃ সংস্কার হইয়া গিয়াছে। এই উদ্যানের পার্শ্বে কাবেরী নদী বহিতেছে। সম্প্রতি মহিসুর-রাজের ব্যয়ে বাগানবাটী হইতে কাবেরীনদী পর্য্যন্ত একটী ঘাট প্রস্তুত হইয়াছে।

৭ম। আমরা তথা হইতে দুর্গের ভিতর ফিরিয়া আসিতে আসিতে দেখিলাম, বিজয়নগরের রাজা ও মহিসুররাজদিগের বাসভবনের ভগ্ন চিহ্ন সকল রহিয়াছে। নরসিংহ স্বামীর

মন্দির বাহির হইতে দেখিলাম, সময়াভাবে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারি নাই। ইহা ১৬৩৮ খৃঃ হইতে ১৬৫৯ খৃঃ মধ্যে কাস্তিরব্ নরশা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দিরের বাৎসরিক ব্যয় কারণ ১৭৩৯৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে।

৮ম। দুর্গের উত্তর দেওয়ালে কৃষ্ণদিদ্দী নামে যে দরজা আছে, তাহার নিকটে জমীর ভিতর কয়েকটী খিলান ঘর আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। এই দেওয়ালে কয়েকটী গর্ত্ত আছে। বন্দী ইংরেজ সৈন্যদিগের মধ্যে অধিকাংশই ঐ ঘরের ভিতরে শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া থাকিত। মৃত্তিকার ভিতরেও ঐরূপ এ কয়েকটী খিলান ঘর ছিল; সেখানে ইংরেজ কয়েদীদিগকে বন্ধন করিয়া রাখা হইত।

৯ম। আমরা সর্ব্বশেষে শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর মন্দিরে যাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অতি পুরাকালে এই মন্দিরের মূলপত্তন হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে আকার বৃদ্ধি পাইয়া উহা প্রস্তর নির্ম্মিত সুদৃঢ় উচ্চ দেওয়াল দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। সম্মুখের দরজায় বৃহৎ গোপুর, গোপুরের চূড়ায় ৫ পাঁচটী পিত্তলের কলসীর নিকট নৃসিংহমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। মূলস্থানে আদি শেষনাগের উপর একপার্শ্বে শয়ন অবস্থায় প্রকাণ্ড বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজমান। অবশ্য উহা একখণ্ড প্রস্তর হইতে কাটা; ইহা পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না। সম্ভবতঃ উহা পুরাতন মূর্ত্তির উপর স্থাপিত হইয়া থাকিবে। আমরা যথারীতি অষ্টোত্তর শত নাম দ্বারা এবং পরাহিত মন্ত্রপাঠে আরতি অন্তে কর্পূরালোকে মহা-

বিষ্ণুর মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। মন্দিরের সম্মুখে উৎসবমণ্ডপ, এই দেবালয়ের ব্যয়-কারণ মহিস্থররাজসরকার হইতে বাৎসরিক সাত হাজার একশত আশি টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে।

এই দেবালয়ে পৌষমাসে শুক্ল সপ্তমীতে রথোৎসব হইয়া থাকে, সেই রাত্রে গজেন্দ্র মোক্ষণোৎসব হয়।

কার্ত্তিকী বা তুলা অমাবস্থায় কাবেরী স্নান উৎসব হইয়া থাকে, সেই দিবসে বহু লোক কাবেরীতে স্নান করিয়া শ্রীরঙ্গ-নাথ স্বামী দর্শন করিয়া থাকেন।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বৃন্দাবনোৎসব হইয়া থাকে, এবং সেই সময় শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর ভোগমূর্ত্তি বাহক স্কন্ধে রাত্রিকালে সহর পরিদর্শন করেন।

১০। শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর মন্দির হইতে আসিতে আসিতে দি-হোলিল্যাণ্ডের খিলান দেখি। কাপ্তেন দি-হোলিল্যাণ্ড ১৮০৮ হইতে ১৮১০ খৃঃ পর্য্যন্ত শ্রীরঙ্গপত্তনে ছিলেন। মন্ত্রিবর পূর্ণিয়ার আদেশে এই খিলান তৈয়ার হয়। উহা দীর্ঘে ১১২ ফুট, প্রস্থে ৪ ফুট, মধ্যের গভীরতা ৫ ফুট এবং ঊর্দ্ধে ১১ ফুট ১১ ইঞ্চি। কাবেরী নদীতে সেতু নির্ম্মাণের কল্পনা হইয়াছিল, তজ্জন্য নমুনা স্বরূপ এই খিলান তৈয়ার হইয়াছিল। ইহা দর্শন করিয়া রেলষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গাড়ীর জন্য প্রতীক্ষা করি।

এখান হইতে ১১ মাইল পশ্চিম উত্তরে যাদবপুরী বা তন্নূরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, উহা বল্লালরাজাদিগের রাজধানী ছিল। এইস্থানে গোপালকৃষ্ণ স্বামী ও নারায়ণ স্বামীর বৃহৎ মন্দির

বিদ্যমান রহিয়াছে, রামানুজাচার্য্য যাদবপুরীতে অবস্থানের সময়, তথাকার জৈনমন্দির ভগ্ন করিয়া, সেই মালমসলায় নারায়ণ স্বামীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উক্ত মন্দিরের নিত্য সেবার কারণ মহিসুররাজ হইতে বাৎসরিক ১২২০৲ এক হাজার দুইশত কুড়ি টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। তথায় মতিতলাও নামে এক বৃহৎ হ্রদ আছে, তাহার বেড় ১৫ মাইলের কম নহে। যাদব নদী দুইটি পাহাড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত; সেই নদী রোধ করিয়া উক্ত হ্রদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে বাঁদটী দেওয়া হইয়াছে, তাহা দৈর্ঘ্যে ২২৫ ফুট, প্রস্থে ৩৭৫ ফুট এবং উচ্চ ২৮ ফুট। রামানুজাচার্য্যের উৎসাহে ও আগ্রহে রাজা বল্লাল বিষ্ণুবর্দ্ধনরাজ-কর্ত্তৃক উক্ত হ্রদ প্রস্তুত হইয়াছিল।

ফরাসী পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম ১৫ মাইল দূরে ও যাদব-পুরীর ৮ মাইল উত্তরে পাহাড়ের উপর যাদবগিরি নামে শ্রীবৈষ্ণবদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থ, উহা দক্ষিণ বদরীকাশী নামে কথিত হইয়া থাকে। এই স্থানে পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে যোগী নরসিংহ স্বামী বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার নিত্যসেবার জন্য মহিসুররাজ-দরবার হইতে বাৎসরিক এক হাজার ছয়-শত পঁচিশ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে।

২য়। পর্ব্বতের মধ্যদেশে প্রসিদ্ধ শ্রীনারায়ণ স্বামীর মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের চল্ল-পিল্লরায় বা চলুভরায়ের মূর্ত্তি বিরাজমান। প্রবাদানুসারে চল্ল-পিল্লরায় দিল্লীর সেনানায়ক কর্ত্তৃক দিল্লী-সহরে আনীত হইয়াছিল। রামানুজাচার্য্য দিল্লীতে গমন করিয়া

তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মন্দির অতি বৃহৎ, ইহার চারিদিকে প্রশস্ত বারান্দা। এখানকার প্রধান উৎসব বৈরমুড়ী নামে খ্যাত। উক্ত উৎসব শুক্ল ফাল্গুন পঞ্চমীতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমাতে সমাপ্ত হয়। সেই সময়ে তথায় প্রায় বিশহাজার লোক উপস্থিত হইয়া থাকে। চলুভ রায়ের মন্দিরের সন্নিকট একটী জলাশয়ের ধারে অনেকগুলি মণ্ডপ বা ছত্র আছে, তথায় আগন্তুক ও সন্ন্যাসীগণ বিশ্রাম করিতে স্থান পাইয়া থাকে। চলুভ রায় স্বামীর নিত্যসেবার কারণ, বাৎসরিক বিশ হাজার দুইশত পঁচানব্বই টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে।

শ্রীরঙ্গপত্তনের দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে ২০ মাইল দূরে সোমনাথ-পুর নামে অতি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্রে প্রসন্ন-চন্দ্র-কেশবের প্রসিদ্ধ দেবালয় রহিয়াছে। তাহার গঠন-প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট। ইহাও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিদিগের তীর্থস্থান। সময়াভাবে আমরা পূর্ব্বোক্ত তিনটী তীর্থস্থান সন্দর্শন করিতে পারি নাই।

উপসংহার।

মহিস্থরের চামুণ্ডা পাহাড়ে মহিষমর্দ্দিনী ও নরসিংহ স্বামীর ও শ্রীরঙ্গপত্তনের রঙ্গনাথ স্বামীর অর্চ্চনার সময়ে অর্চ্চকগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইতে হয় নাই; অতএব উভয় স্থানের ভগবানের পূজা ও অর্চ্চনা করিয়া মনের তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে।
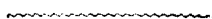
তিরুপতি।

১৮৯০ খৃঃ ১লা জুলাই তারিখে পুতল-পেট হইতে তিরুপতি দর্শনাভিলাষে যাত্রা করি। ইহা অরুকদ্ব জেলার প্রধান বৈষ্ণব-তীর্থ। আমরা কতক রাস্তা জট্‌কা যোগে অতিবাহিত করিয়া বিল্বপুর গুণ্টাকুল রেলের পাকাল জংসন শাখা রেলের ব্যালেষ্ট ট্রেনের সাহায্যে তিরুপতি-রেলষ্টেশনে আসিয়া পৌছি। ষ্টেশনটি নিম্ন তিরুপতি সহর হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে মাদ্রাজরেলের রাণিগুণ্টা নামক ষ্টেশন হইতে মিটর-গেজ্‌রেল তিরুপতিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, এক্ষণে বিশ্বপুর গুণ্টাকুল রেলের পাকাল জংসন হইতে শাখা রেলযোগ হওয়ায় দক্ষিণ দিক্ হইতে তথায় আসিবার সুবিধা হইয়াছে।

আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে রেলঘরে রাত্রি যাপন করিয়া পর দিবস প্রাতে শ্রীনিবাস ব্যঙ্কট্ স্বামী দর্শনে বহির্গত হই। যে পাহাড়ের উপর শ্রীনিবাসদেবের মন্দির, তাহা সাধারণের নিকট তিরুমলয় নামে পরিচিত, উহা নিম্ন তিরুপতি হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে হইবে। তিরুমলয়ে উঠিবার চারিটী প্রধান বর্ত্ম আছে, ১মটি নিম্ন তিরুপতি হইতে উত্তরাভিমুখে, ২য়টি চন্দ্র-গিরির দিক হইতে পূর্ব্বোত্তরাভিমুখে, ৩য়টি নাগাপট্ট হইতে

পশ্চিমদিকে ও ৪র্থটি বালপট্টু হইতে পূর্ব্বদিকে। এতদ্ব্যতীত উপরে উঠিবার আরও অনেকগুলি সুঁড়িপথ আছে। আজকাল রেলপথে যাতায়াতে সুবিধা প্রযুক্ত অনেকেই নিম্ন তিরুপতির দিক্ হইতে পর্ব্বতে উঠিয়া থাকেন। আমরাও সেই দিক্ দিয়া উঠিয়াছিলাম। উঠিবার সিঁড়ি নিম্ন তিরুপতি হইতে ১ মাইল দূরে হইবে। তিরুপতি পাহাড়শ্রেণীতে ৭টি প্রধান শৃঙ্গ আছে, প্রত্যেকটি পুণ্যভূমি বলিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ, যে শৃঙ্গটি শেষাচল নামে কথিত, তাহারই উপরে শ্রীনিবাসরাজের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই কারণে কখন কখন সমস্ত পাহাড়কেও শেষাচল নামে কথিত হইয়া থাকে। এই গিরির অপর নাম ব্যঙ্কট্। স্কন্দপুরাণ মতে ব্যঙ্কট্‌গিরি মেরুর অংশ, যেরূপে মেরু-সন্নিধান হইতে তিরুপতিতে আসিয়াছিল, নিম্নে তদ্বিবরণ দেওয়া গেল ;—

কোন সময়ে বিষ্ণু রমার সহিত অন্তঃপুরে ক্রীড়া করিতেছিলেন, শেষনাগ পুরদ্বারে বসিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছিল। বায়ু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, শেষ নিষেধ করিয়া কহিল, তুমি ভিতরে যাইওনা, এই স্থানে থাক। তৎশ্রবণে বায়ু কহিল, অহো, তুমি ভৃত্য তোমার কথা মানিতে পারি না ; অবশ্য ভিতরে যাইব। ক্রমে পরস্পর বচসা করিতে লাগিল। বায়ু বলপ্রয়োগে ভিতরে যাইবার চেষ্টা করিলে শেষ বিরক্ত হইয়া উঠিল ও কহিল তুমি বলপ্রয়োগে ভিতরে যাইতে পারিবে না, অথবা বৃথা বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়ো-

জন কি, আমাদের মধ্যে কে বলবান্ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই হয়। ভগবান্ বিষ্ণু দ্বারদেশে কলহশব্দ শুনিয়া বহির্ভাগে আসিয়া কহিল তোমরা কিসের বচসা করিতেছ? বচসার কারণ অবগত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু শেষকে কহিলেন, বায়ু সমস্ত লোকের অন্তরাত্মা ও প্রাণ, অতএব তুমি উহাকে আমা হইতে অধিক বলবন্ত জানিবে, তৎশ্রবণে শেষ গর্ব্বিত স্বরে কহিল, ভগবন্! বায়ু ও আমার মধ্যে কে বলবান্ আজ তাহা স্বচক্ষে দেখুন। জাম্বুনদতটে মেরুপুত্র ব্যঙ্কটগিরি আছে, আমি তাহার শীর্ষ বেষ্টন করিয়া থাকিব, বায়ু যদি আমাকে তথা হইতে অপসারিত করিতে পারে, তবে জানিব বায়ু আমা হইতে বলবান্। শেষ, হৃষিকেশকে এইরূপ কহিয়া কালবিলম্ব না করিয়া ব্যঙ্কটগিরি বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন বায়ু প্রচণ্ড ঝড় উৎপাদন করিয়া স্থাবর জঙ্গম কাঁপাইতে কাঁপাইতে শেষ সহিত পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎপাটন ও উড়াইয়া অর্দ্ধলক্ষ যোজন দূরে দক্ষিণ সমুদ্র হইতে ৩২ যোজন উত্তরে ও পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম ভাগে স্বুবর্ণমুখী নদীর বামতটে ফেলিয়া দিল। শেষ, পতন জন্য বিশীর্ণ দেহ ও লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া আপনাকে অবমানিত বোধে ব্যঙ্কট গিরি আশ্রয় করিয়া স্বামী পুষ্করিণীর বায়ুদিকে মনোহর নাগতীর্থে গমন করিলেন। নাগতীর্থে গমন করিয়া সহস্র বৎসর ধরিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর তপস্যা করিতে থাকিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু তাহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, বৎস

শেষ! তোমার তপে তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। শেষ তৎশ্রবণে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! যদি আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে এই বর দিন, যেমন বৈকুণ্ঠে আমার কুন্তলে আপনি বাস করেন, তদ্রূপ ব্যঙ্কটস্থিত শৈলরূপ মৎদেহে আপনি নিত্য বাস করুন ভগবান্ হরি তথাস্তু বলিয়া, তদবধি শঙ্খচক্র হস্তে শেষ-শৈলে বাস করিতেছেন। ব্যঙ্কটগিরির উপরস্থিত বলিয়া তিনি বাঙ্কটেশ বা ব্যঙ্কটপতি নামেও অভিহিত হয়েন। কোন্ সময়ে এই ঘটনা হয়, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু ব্যঙ্কটপতি বর্ত্তমান অষ্টাবিংশ কলির পূর্ব্ব হইতে এই স্থানে অবস্থিত করিতেছেন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বরাহপুরাণে দেখা যায় যে, ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাভি-যানকালে সদলে এই স্থানে আসিয়া স্বামীতীর্থে স্নান করি-য়াছিলেন। উক্ত পুরাণে একচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে দেখা যায়, পাণ্ডবগণ বনবাসকালে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে ব্যঙ্কটশৈলে আসিয়া এক বৎসর কাল তথায় বাস করিয়াছিলেন ও যে তীর্থতটে তাহারা ছিলেন, তাহা পাণ্ডবতীর্থ নামে অভিহিত হইতেছে।

স্কন্দপুরাণে শ্রীব্যঙ্কটাচল-মাহাত্ম্যে দেখা যায়, শ্রীরামানুজা-চার্য্য ব্যঙ্কটশৈলে আসিয়া আকাশগঙ্গা নামক তীর্থের ধারে পঞ্চ অক্ষর মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুর ধ্যান করিয়াছিলেন; বিষ্ণু তাঁহার তপে সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। রামানুজ কলির ৪১১৮

অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব প্রায় ৯০০ শত বৎসর পূর্ব্বেও এই মহাতীর্থ প্রসিদ্ধ ছিল।

পর্ব্বত-শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঝরণা ও তাহার নিকট ছোট বড় জলাশয় আছে, তাহারা সকলেই পুণ্যতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। তাহাদিগের মধ্যে ৭টি প্রধান। ১ম স্বামীতীর্থ, ২য় বিয়ৎগঙ্গা বা আকাশগঙ্গা, ৩য় পাপবিনাশিনী, ৪র্থ পাণ্ডব-তীর্থ, ৫ম তুম্বীরকোনা, ৬ম কুমারবারিকা, ৭ম গোগর্ভ।

স্বামীতীর্থ লম্বা ১০০ গজ ও প্রস্থে ৫০ গজ, চারিদিকে গ্রেনাইট প্রস্তর দ্বারা সোপান বাঁধান। এই তীর্থ দেবালয়ের নিকট, ইহাতে যাত্রীগণ অবগাহন করিয়া থাকে। পাপবিনা-শিনী-তীর্থ দেবালয় হইতে ৩ মাইল দূরে, একটি সামান্য জল-প্রপাতের নীচে অবস্থিত; এই জলপ্রপাতের নীচে দাঁড়াইয়া স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যারূপ গুরুতর পাপ বিনষ্ট হয়; এমন কি প্রবাদ এইরূপ যে, স্নান করিবার সময়ে পাপের তারতম্য হেতু জলের বর্ণ পর্য্যন্ত ময়লা হইয়া থাকে। পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে যে জলপ্রপাত তাহাই তুম্বিরকোণা নামে পরিচিত। পূর্ব্বে এই স্থানে ঋষিগণ বাস করিতেন, এক্ষণে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হওয়ায় বন্যপশ্বাদির আবাস স্থান হইয়াছে।

আমরা প্রথমে রেল-ষ্টেশন হইতে জট্‌কাযোগে রুহিদাস নামক কোবিলতীর্থে (কপিলতীর্থ) আসিয়া পৌঁছি। এই তীর্থে অনেক যাত্রীগণ পূজা দিয়া আপন আপন মানসিক ব্যঙ্কটেশ-কাঁটা গলে ধারণ করিয়া উপরে গমন করে, উক্ত কাঁটা স্বর্ণ

অথবা রৌপ্য নির্ম্মিত। আমরা যৎকালে তথায় আসিয়া পৌঁছি, দেখিলাম একটী স্ত্রীলোক পূর্ব্বোক্ত রৌপ্যনির্ম্মিত কাঁটা ধারণ করিতেছে, পরে পদযোগে তিরুমলয়ে গিয়া স্বামীতীর্থে স্নান করিবে। আরও শুনিলাম যে কাঁটাধারী বা ধারিণী স্বামীতীর্থে স্নান করিলে ঐ কাঁটা তাহার কপোলদেশ হইতে খুলিয়া পড়ে, কিন্তু আমরা তাহা দেখি নাই। নর্ম্মদানন্দ স্বামী নামে কোন সাধু দুই মাস তিরুমলয়ে বাস করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালে কুড়িজন কাঁটাধারিকে স্নান করিবার কালে কপোল হইতে কাঁটা খুলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু কিরূপে খুলিয়া পড়ে তাহা বুঝিলাম না, তবে তাহা ব্যঙ্কটের ভিক্ষার ঝুলিতে অর্পণ করা হইয়া থাকে।

রুহিদাস কোবিলের পশ্চাতে যে বৃহৎ গোপুর আছে, তাহা অলিপিলি নামে খ্যাত। এই গোপুরের দ্বার পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোক আসিতে পারে, ইহার পর কেবল ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও সৎশূদ্রগণ মাত্র অগ্রসর হইতে পারে; এই স্থান হইতে উপরে উঠিবার পাকা সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে। অনেকেই পদব্রজে গমন করে, কিন্তু যাহারা সিঁড়ি পার হইতে অক্ষম, তাহারা ডুলিতে চাপিয়া উঠিয়া থাকেন। এই সিঁড়ি প্রায় এক মাইল লম্বা ও জমীর সমতল হইতে ন্যূনাধিক এক হাজার ফুট উচ্চ হইবে। উহা অনেকগুলি ছোট ছোট মণ্ডপের ভিতর হইয়া গিয়াছে। অতএব যাত্রীগণ ক্লান্ত হইলে বিশ্রাম করিবার স্থান পায়। সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ স্থানে একটি বৃহৎ গোপুর আছে, তাহা গালি

গোপুর নামে খ্যাত; এই গোপুরের পশ্চাতে বৈকুণ্ঠ নামক কোবিল রামকৃষ্ণের মূর্ত্তি বিরাজমান এবং ইহার সন্নিকটে বিশ্রামের স্থানও আছে, অনেক যাত্রী পদব্রজে উঠিয়া ক্লান্ত হইলে এই স্থানে বিশ্রাম করেন ও রামকৃষ্ণের পূজা করিয়া থাকেন। এই মন্দিরের ঈশানকোণে বৈকুণ্ঠগুহা নামে এক গুহা আছে, পুরাণমতে শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীশৈলে আগমনকালে তাঁহার অনুচরগণ উক্ত গুহায় আশ্রয় লইয়া ছিল। এই স্থান হইতে ব্যঙ্কটেশ মন্দিরে যাইবার পাকা রাস্তা আছে; আমরা, পর্ব্বতের উপরিস্থ গহ্বরের ভিতর হইয়া মধ্য মণ্ডপ ও গোপুরের মধ্য দিয়া ডুলিযোগে বেলা সাড়ে নয় ঘটিকার সময়ে উপরে পৌছিলাম।

তিরুমলয় গিরিস্থ নগরটি সামান্য; ইহা স্বামীতীর্থের ব্যঙ্কট স্বামী ও বরাহস্বামীর মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে অবস্থিত। ১৮৮১ সালের লোকসংখ্যার তালিকা অনুসারে এখানে ১৫১৭ জন মাত্র লোক বাস করিত; তাহাদিগের মধ্যে সমস্তই হিন্দু অপর জাতি বাস করিতে পায় না।

এখানে যাত্রীদিগের থাকিবার জন্য অনেকগুলি ছত্র আছে, উহা মহিসুর ও কোচিনের রাজা ও কালহস্তীর ব্যঙ্কটগিরির জমিদারগণ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের সম্মুখে পথের পার্শ্বে কয়েকখানি দোকান আছে, তাহাতে পিত্তলের বাসন, ব্যঙ্কটেশ স্বামীর মূর্ত্তি ও আহার্য্য দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে; অপর দিকে উচ্চ জমীর উপর মহান্তের আখড়া, বৈরাগীগণ

ঐ স্থানে আহার পাইয়া থাকে; তাহার পার্শ্বে সহস্রস্তম্ভমণ্ডপ, এই স্তম্ভের কার্য্য অতি পরিপাটী, ইহা প্রায় এক সহস্র গ্রেনাইট প্রস্তরের স্তম্ভের উপর বিস্তৃত রহিয়াছে। যে সকল স্তম্ভ রাস্তার দিকে, তাহার প্রত্যেকটিতে বড় বড় মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে, ভিতর দিকের স্তম্ভ সাদা; এই মণ্ডপের একাংশ পড়িয়া গিয়াছিল, ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহার জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে। মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া যে পথ গিয়াছে, তাহার এক পার্শ্বে এক খানি অপূর্ব্ব পাথর পড়িয়া রহিয়াছে। শুনিলাম উহা প্রস্তরময়ী রথের চক্র মাত্র; অর্চ্চকগণ কহিয়া থাকেন যে, চন্দ্রচোল নামে কোন রাজা একথানি প্রস্তরময়ী রথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন[১] ও পূর্ব্বে সেই রথে ভগবান্ ব্যঙ্কটেশের রথোৎসব ক্রীড়া হইত; এক্ষণে সে রথ নাই, ঐ পাথরখানি তাহার চিহ্নস্বরূপ পড়িয়া আছে।

আমরা মহান্তের আখ্ড়ায় বিশ্রাম করিয়া স্বামীর দর্শন অভিলাষে দেবালয়ের দিকে আসিলাম; পথপ্রদর্শক প্রথমে আমাদিগকে স্বামীতীর্থে লইয়া গেলেন; এই তীর্থের জল অপরিষ্কার হইলেও অনেকে তাহাতে অবগাহন করিতে দেখিলাম। যাহারা চুল রাখিবার ব্রতপালন করিতেছিলেন, তাঁহারা স্বামীতীর্থের এক পার্শ্বে মস্তক মুণ্ডন করিয়া পরে অবগাহন করিতেছেন। আমরা স্নান না করিয়া তীর্থ-বারিস্পর্শে

(১) হাম্পিণসহরেও বিথলদেবের মন্দিরের সম্মুখে একটি প্রস্তরময়ী রথ আছে।

তৎকার্য্য সম্পাদনপুরঃসর মন্দিরের অভ্যন্তরে গমন করিলাম; মন্দিরের বহির্ভাগ হইতে অভ্যন্তর দেখিবার উপায় নাই। কোন খৃষ্টান্ বা মুসলমানকে বহির্ভাগেও আসিতে দেওয়া হয় না। ১৮৭০ সালে কোন ইংরাজ মাজিষ্ট্রেট খুন অনুসন্ধান করিতে আসিয়া প্রথম গোপুর পর্য্যন্ত আসিতে পারিয়াছিলেন। গত বৎসর মহান্তের বিরুদ্ধে দেবালয়ের সঞ্চিত ধন অপচয়ের অভিযোগ উপস্থিত হইলে পুনরায় ইংরাজ মাজিষ্ট্রেট আসিয়াছিলেন; তিনিও ধ্বজস্তম্ভের নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবালয় তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; বাহিরের প্রাচীর কৃষ্ণবর্ণ গ্রেনাইটপ্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত, তাহার এক পার্শ্বে একটি বৃহৎ অনুশাসন খোদা এবং ইহার দরজায় একটি সামান্য গোপুর আছে; এই প্রাচীর ১৩৭ গজ লম্বা ও ৮৭ গজ প্রশস্ত।

দেবালয়টি অতি বৃহৎ নহে, ইহার মূলস্থানের উপর যে গম্বুজ (ডোম) আছে, তাহার উপরিভাগ কলধৌত স্বুবর্ণপত্রী দ্বারা মণ্ডিত, মূলগৃহ অতি ক্ষুদ্র তাহাতে বায়ু প্রবেশের পথ নাই; তাহার মধ্যস্থলে সাত ফুট উচ্চ প্রস্তরময় চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দণ্ডায়মান; তাঁহার দক্ষিণের এক হস্তে চক্র, অপর হস্ত পৃথিবীর দিকে দর্শাইয়া ভক্তদিগকে তিরুমলয়ের অসামান্য উৎপত্তির বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছেন ও বামদিকের এক হস্তে শঙ্খ, অপর হস্তে পদ্ম বিরাজ করিতেছে।

এই স্থানের দেবদর্শন করিতে হইলে কিছু দর্শনী দিতে হয়,

যদি কেহ দেবের দুগ্ধস্নান দর্শন করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ১৩৲ টাকা দিতে হইবে। এই সময়ে দেবের গাত্র হইতে অলঙ্কারাদি মোচন করিয়া পুরুষসূক্ত বেদপাঠ করিতে করিতে তৈল ম্রক্ষণ করাইয়া দুগ্ধ ও অন্যান্য তীর্থ-জলে স্নান করাইয়া, মাল্য চন্দন বসন ও আভরণ দ্বারা অলঙ্কৃত করাইয়া থাকে। অতএব সে সময়ে প্রকৃত প্রস্তরময় দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তুলসী দ্বারা সহস্র নামের অর্চ্চনার সময়ে কেহ দেবদর্শনে অভিলাষ করিলে, তাঁহাকে ৭৲ টাকা দিতে হয়। আর কেবল কর্পূরালোকে দেবদর্শন করিলে দর্শনী ১৲ টাকা মাত্র দিতে হয়; বেলা ১২টা হইতে ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত অর্চ্চনা ও নিত্য রাজভোগাদি কার্য্য হইয়া থাকে; তৎপরে বিনা দর্শনীতে সাধারণের দর্শনের জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টা দ্বার খোলা থাকে। দর্শনী হিসাবে দেবালয়ের অনেক টাকা আয় হইয়া থাকে। অরুকড় প্রদেশ ইংরাজ-শাসনাধীন হওয়া অবধি ১৮৪৩ সাল পর্য্যন্ত এই দেবালয় গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে ছিল, সে সময়ে খরচখরচা বাদে অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইত, এমন কি প্রথম ছয় বৎসর দুই লক্ষ টাকার অধিক আয় হইয়াছিল। ক্রমে সেই আয় কমিয়া আসিতেছে; পুরাণমতে এই দেবের মাহাত্ম্য কলির পাঁচহাজার বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবে ও ক্রমে যে মাহাত্ম্য কমিবে তাহা আয়েতে জানা যাইবে; পূর্ব্বে বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে অনেক লোকের সমাগম হইত; কথিত আছে যে, ১৭৭২ খৃঃ বাৎসরিক উৎসব সময়ে প্রথম বিসূচিকার উৎপত্তি হয়।

১৮৪৩ সালে দেবালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার মহান্তের উপর অর্পিত হয়; সেই অবধি দেবালয়ের অবনতির আরম্ভ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান মহান্ত স্বয়ং বিলাসী, কাজেই দেবালয়ের দিকে দৃষ্টি রাখেন না, তিনি দেবসম্পত্তির বিস্তর টাকা অপচয় করিয়াছেন; সেই অপরাধে তিনি তিন বৎসর কারাবাসে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি, অভিযোগের সময় বেগতিক দেখিয়া আপন পদে এক শিষ্যকে নিযুক্ত করেন; তাঁহার মুক্তির কারণ শেসন্‌জজের বিরুদ্ধে প্রথমে হাইকোর্টে পরে মান্দ্রাজ গবর্ণরের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল; কিন্তু হাইকোর্ট কিম্বা মান্দ্রাজ গবর্ণর তাহা গ্রাহ্য করেন নাই[১]। এখন দেবালয়ের বাৎসরিক আয় একুশ হাজার টাকা ও ব্যয় চৌদ্দ হইতে পনর হাজার টাকা হইয়া ছয় সাত হাজার টাকা জমা থাকে।

অন্যান্য দেবালয় সদৃশ এই দেবালয়ে দেবাঙ্গনা নাই, এমন কি পূর্ব্বে কোনও কুলটা এই পুণ্যময় পাহাড়ে পদার্পণ করিতে পারিত না; এক্ষণে সে কাল গিয়াছে, অনেক অর্চ্চক, বৈরাগী ও পুরোহিত আপন আপন উপপত্নী সঙ্গে লইয়া গমন করিয়া থাকেন। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বলরাম দাস নামে মহান্তের চরিত্রের উপর সংশয় উপস্থিত হইলে, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া আপনাদিগের মধ্যে গোবর্দ্ধন দাস নামে এক ব্যক্তিকে

---

(১) তিনি সম্প্রতি কারাগার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, কারাগৃহবাস-জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আপন গদীর ভার লইয়াছেন।

তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে যে, এই বর্ত্তমান দেবালয় কলির প্রথমেই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

যে সকল মহাত্মগণ এই দেবালয়ের উন্নতি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম অদ্যাপি মন্ত্রপুষ্পের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে ও দেবালয়ের হস্তলিপি গ্রন্থে তাহাদিগের বিবরণ পাওয়া যায়, সেই বিবরণে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, করিস্কুও মহারাজ প্রাঙ্গণের দ্বিতীয় প্রাচীর ও তাঁহার পুত্র জনমেজয় বহির্ভাগের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কিন্তু ইহাঁরা কোন্ সময়ে ও কোথাকার রাজা ছিলেন এবং কোথায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহাদিগের পরে বিক্রম মহারাজ নামে অপর কোন রাজা বর্ত্তমান মন্দিরের সংস্কার করিয়াছেন। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, তণ্ডীমন চক্রবর্ত্তী মহারাজ বর্ত্তমান মূলমন্দির নির্ম্মাণ করেন, সেই হিসাবে বর্ত্তমান মূল মন্দির সাতশত বৎসরের অধিক হইবে না; কাঞ্চিপুরে উক্ত রাজার রাজধানী ছিল, তাহা পূর্ব্বে কাঞ্চিপুরের বিবরণে দেখাইয়াছি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও এতদ্বিষয়ের অস্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত পুরাণের এক স্থানে কথিত আছে যে, নারদ কোন সময়ে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথের দর্শন করিতে গিয়া কহিয়াছিলেন যে, গঙ্গার দক্ষিণ এক সহস্র ক্রোশ অন্তরে ও পূর্ব্বসাগরের পঁচিশ ক্রোশ পশ্চিমে এক মনোহর গিরি বিদ্যমান আছে। তৎশ্রবণে বিষ্ণু কহিলেন যে, আমি কলিযুগে চোলরাজপুত্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজা গ্রহণ করিব। তাহাতে কোন কোন ইতিহাসবত্তোগণ মনে করেন যে, পূর্ব্বে এই স্থান শৈবদিগের অধিকারে ছিল, যে মূর্ত্তি অদ্যাপি বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া কথিত তাহা সুব্রহ্মণ্য স্বামীর মূর্ত্তি। তৎসম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, কোন সময়ে রামানুজাচার্য্য এই স্থানে আসিয়া দেখেন যে, মূর্ত্তির হস্তে শঙ্খ চক্র নাই এবং তিনি সুব্রহ্মণ্য স্বামী নামে পূজা পাইয়া থাকেন; তাহার পর বিয়ৎগঙ্গা নামক তীর্থে বিষ্ণুর উপাসনা করণান্তর প্রকাশ করেন যে, এই প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি সুব্রহ্মণ্য স্বামীর নহে, বিষ্ণুর প্রকৃত মূর্ত্তি। দেবের সম্মুখে যদি শঙ্খ চক্র রাখা যায়, দেব তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। পরে শঙ্খ চক্র আনয়ন করিয়া দেবের সম্মুখে রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিতে আজ্ঞা দেন; পর দিবস দরজা খোলা হইলে দেখা গেল যে, পূর্ব্বোক্ত শঙ্খ চক্র দেবের হস্তে বিরাজিত রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে আপামর সকলেই উহা বিষ্ণুর প্রকৃত মূর্ত্তি বলিয়া বিশ্বাস করিল ও তদবধি এই মূর্ত্তি বিষ্ণু বলিয়া পূজা পাইতেছেন। অর্চ্চকগণ কহেন যে, আমরা স্মার্ত্ত হইলেও নামন অর্থাৎ শ্রীবৈষ্ণবদিগের তিলক ধারণ করিয়া থাকি। তাঁহারা শ্রীরামানুজাচার্য্য কর্ত্তৃক বিষ্ণুপূজার নিয়মানুসারে পূজা করিতেছেন। আরও একটি কথা এই এখানে লক্ষ্মীদেবীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নাই, কিন্তু কথিত আছে যে ব্যঙ্কটেশ নারায়ণবন নামক স্থানে মৃগয়া করিতে গিয়া তথাকার রাজকন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করেন ও সেই স্থানে কল্যাণব্যঙ্কটেশ নামে অভিহিত হইতে-

ছেন। এতদ্বিষয়ের বিবরণ নারায়ণবনের বিবরণে বিশেষরূপে বলা যাইবে।

এখানকার প্রধান উৎসব আশ্বিন মাসের ১০ দিন ব্যাপিয়া হইয়া থাকে। উৎসবের পঞ্চম দিবসে গরুড়োৎসব ও দশম দিবসে নারায়ণবনে পদ্মাবতীর সহিত বাৎসরিক কল্যাণোৎসব হইয়া থাকে।

মূলস্থানের সম্মুখে একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গৃহ ও তাহার সম্মুখে প্রস্তরময় স্তম্ভের উপর একটি মণ্ডপ আছে, এই মণ্ডপের এক স্থানে একটি পিত্তলের ঘড়ার মুখে এক বৃহৎ থলি কড়িকাট হইতে ঝুলিতেছে। যাত্রীগণ সাধ্যানুসারে উক্ত থলিতে স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা, পয়সা আদি দান করে, এতৎ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, ভগবান্ ব্যঙ্কটেশ পদ্মাবতীর কর প্রার্থী হইলে, আকাশরাজ নারায়ণবনে কন্যা সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হন, তখন ভগবান্ ব্যঙ্কটেশ যাত্রীগণকে তথায় লইয়া যাইবার ব্যয়ের কারণ কুবেরের নিকট হইতে অনেক টাকা ঋণ করিতে বাধ্য হন, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও সে টাকা পরিশোধ হয় নাই। অতএব ভিক্ষার ঝুলি রাখিয়া দিয়াছেন, ভক্তগণ ঋণ পরিশোধের কারণ ঝুলিতে যথাসাধ্য দিয়া থাকেন, দিনান্তে সেই থলি একবার খোলা হয় ও তাহাতে যাহা পাওয়া যায় তাহা হিসাবে জমা হয়।

ব্যঙ্কটেশ স্বামীর মন্দিরের বহির্ভাগে স্বামী পুষ্করিণীতীরে একটি সামান্য মন্দিরে বরাহস্বামীর মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, কোন সময়ে যজ্ঞবরাহ বিচরণ করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়াছিলেন, অতএব ইনি ঐ শৃঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অনন্তর ব্যঙ্কটেশ স্বামী যখন তথায় বাসস্থান নিরূপণ করিয়া অবস্থিতি করিতে আইসেন, বরাহ স্বামী তাহাতে প্রতিবাদ করেন; তখন ব্যঙ্কটেশস্বামী তাঁহাকে এই বলিয়া সন্তোষ করেন যে, সকল যাত্রীগণ অগ্রে তোমার পূজা করিয়া পরে আমার পূজা দিবে। সেই অবধি সকল যাত্রীই অগ্রে স্বামীপুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বরাহস্বামীর মন্দিরে গমন করিয়া তাঁহার অর্চ্চনাদি করণান্তর ব্যঙ্কটেশস্বামীর মন্দির প্রাঙ্গণে গমন করেন।

ব্যঙ্কটেশ স্বামীর মন্দিরের সন্নিকটে প্রসিদ্ধ গোগর্ভতীর্থের নিকট ক্ষিত্র-বাল-গুণ্ডি নামে এক প্রস্তরময় স্তম্ভ রহিয়াছে। কথিত আছে যে, এই স্তম্ভ পূর্ব্বে মন্দিরের প্রাঙ্গণে দরজার স্তম্ভের নিকট থাকিত ও প্রতি রাত্রে আভরণ সিন্দুকের চাবি তাহাতে রাখা হইত; এই স্তম্ভ প্রত্যহ দেবালয়ের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। এক দিবস কোন অর্চ্চকের পুত্র দেবালয়ের প্রাঙ্গণের ভিতর নিদ্রা গিয়াছিল, অপর অর্চ্চকেরা তাহা না জানিয়া দেবালয়ের সম্মুখের দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়। উক্ত স্তম্ভ যথারীতি পরিভ্রমণ করিতে করিতে নিদ্রিত অর্চ্চকপুত্রকে তস্কর ভাবিয়া হত্যা করে। সেই অবধি উক্ত স্তম্ভ প্রাঙ্গণের বহির্দ্দেশে গো-গর্ভ তীর্থের সম্মুখে রাখা হইয়াছে। কেহ এ পর্য্যন্ত এই স্তম্ভের সম্মুখে মিথ্যা শপথ করিতে সাহসী

হয় না। এমন কি অনেক অভিযোগ যাহা মুন্‌সেফও নিষ্পত্তি করিতে পারে না, তাহা এইস্থানে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। বাদী ও প্রতিবাদী গোগর্ভতীর্থে স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে ঐ স্তম্ভের নিকট আসিয়া এবং উহা স্পর্শ করিয়া ব্যঙ্কটেশ স্বামীর নামে শপথ করিয়া আপন ব্যক্তব্য প্রকাশ করিলে তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। স্তম্ভ স্পর্শ করিয়া শপথ করিবার পূর্ব্বে বাদী ও প্রতিবাদীকে ফি হিসাবে সাত টাকা দিতে হয়, ইহাতেও দেবালয়ের আয় আছে।

যে সকল লোক রোগে কষ্ট পায় অথবা যাহাদিগের সন্তান জন্মে নাই, তাঁহারাও তিরুপতির ব্যঙ্কটেশস্বামীর মানসিক করিয়া ব্রতধারণ করে ও ব্রতগ্রহণে ফলপ্রাপ্ত হইলে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া থাকে। কথিত আছে যে, দেবের উপর লোকের এতদূর বিশ্বাস যে ব্রত গ্রহণ করিয়া কেহ ব্রত উদ্‌-যাপন করিতে বিস্মৃত হয় নাই; এমন কি যদি কেহ ব্রত উদ্‌-যাপন করিবার পূর্ব্বে মানবলীলা সম্বরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্র বা অপর কোন নিকট সম্বন্ধীয় তাহা উদ্‌যাপন করিয়া থাকে।

ব্রত দুই প্রকারে হইয়া থাকে, ১ম ব্যঙ্কটেশ কাঁটা ধারণ তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ২য় চুল রাখা, যাহারা চুল রাখে, তাহারা স্বামীতীর্থের তীরে আসিয়া মস্তক মুণ্ডন করাইয়া পুষ্করিণীতে স্নান করে। দক্ষিণ দেশের প্রায় সকল লোকই উপরোক্ত ব্রত আবশ্যক মত লইয়া থাকে। বম্বে করাচি, পঞ্জাব,

মধ্যভারত এবং পশ্চিম ও উত্তর ভারতের লোকও স্বামী সন্দর্শ-নার্থ আইসে। পুরুষোত্তমের পাণ্ডার মত তিরুপতির ব্যঙ্কটেশ স্বামীর পাণ্ডারা মহান্তের নিকট সনন্দ পাইয়া ও মহান্তের নামাঙ্কিত ধ্বজা হস্তে করিয়া যাত্রী সংগ্রহের কারণ সর্ব্ব স্থানে বিচরণ করিয়া থাকে।

আমরা, তুলসী অর্চ্চনা দর্শনাভিলাষে দেবালয়ের ভিতরে আসিয়া ৭ টাকা জমা দিলে, কর্ম্মচারী আমাদিগের নাম ধাম লিখিয়া একখানি রসিদপত্র প্রদান করিয়া কহিলেন যে, তুলসী অর্চ্চনার সময় সংবাদ দেওয়া হইবে এবং ঐ রসিদ দরজার নিকট দিলে ভিতরে প্রবেশ করিতে পাওয়া যাইবে। আমরা অনুসন্ধানে আরও জানিলাম যে, তৎকালে দুগ্ধ-অর্চ্চনার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগিবে। অতএব কোন প্রকারে সময় অতিবাহিত করিবার উদ্দেশে মণ্ডপের বাহিরে কতকগুলি নীলবানর সন্দর্শন করিতে থাকিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি আসিয়া আমাদিগকে কহিল যে, মহান্তের নিকট হইতে অনুজ্ঞা আসিয়াছে যে, শুল্ক না লইয়া আপনা-দিগকে দুগ্ধ স্নানাভিষেকাদি সন্দর্শন করিতে দেওয়া হইবে। এস্থানে বলা বাহুল্য যে, আমরা দেবমন্দিরে আসিবার পূর্ব্বে তিরুপতির ষ্টেশনমাষ্টার দেবালয়ের পেস্কারের নিকট আমা-দিগের দেবদর্শনের সুবিধার জন্য সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন; বোধ হয় মহান্ত পেস্কারের নিকট হইতে আমাদিগের আসি-বার সংবাদ পাইয়া পূর্ব্বোক্ত অনুজ্ঞা পাঠাইয়া থাকিবেন।

যাহা হউক, এক্ষণে দেবালয়ের কর্ম্মচারীগণ স্নানাভিষেক দর্শন করাইবার জন্ত আমাদিগকে অতি সমাদরে ভিতরে লইয়া যাইলেন। ভিতরে যাইয়া দেখিলাম যে, দেবগাত্র হইতে আভরণাদি খোলা হইয়াছে ও কয়েকটি ব্রাহ্মণ পুরুষসূক্ত মন্ত্র পাঠ করিতেছে, অর্চ্চক দেবগাত্রে তৈল মর্দ্দন ও হরিদ্রা ম্রক্ষণ করিয়া দুগ্ধ দ্বারা দেবকে স্নান করাইলেন। তৎপরে জলে তীর্থস্নান, পঞ্চামৃতস্নান, তাহার পর দুগ্ধস্নান হইলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি মুছাইয়া বস্ত্র পরিধান করিয়া শ্রীরামানুজমতাবলম্বী নামন অর্থাৎ তিলক পরাণ হইল। তৎপরে কর্পূর, চন্দন, কস্তুরী, কেশরী ইত্যাদি পদযুগলে অনুলেপন করা হইল। অতঃপর স্বর্ণ অলঙ্কারাদি যথা স্থানে বিন্যস্ত হইলে দেব, পুষ্পমালা দ্বারা সুশোভিত হইতে লাগিলেন, এতাবৎকাল বৈদিক কএকটি পুরুষসূক্তাদি মন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন। বেশ বিন্যাস হইলে পর ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে ভিন্ন সংখ্যার আলোকে আরতি এবং পরে কর্পূরালোকে আরতি হইল। অতঃপর কিছুকাল পরে তুলসী দ্বারা সহস্র নামার্চ্চনা হইলে মন্ত্রপুষ্প দেওয়া হইল; মন্ত্রস্তোত্র পাঠের পর অন্যান্য রাজাদিগের নামের সহিত আমাদিগের নামও উচ্চারিত হইয়া মন্ত্রপুষ্প প্রদান করা হইল। আরও দেখিলাম যে সকল আগন্তুক যাত্রীর নামে দেবের অর্চ্চনা হয় না, তবে যাঁহারা অর্চ্চনা সন্দর্শনের জন্য সাত টাকা ফি জমা দেন, অর্চ্চনান্তে মন্ত্রপুষ্প প্রদানের সময় তাহাদিগের নাম গোত্র ও নক্ষত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে, তদন-

ন্তর আমরা মূলস্থান হইতে বহির্দ্দেশে আসিয়া শুনিলাম যে, স্বামীজী ভোগমূর্ত্তিতে বহিঃমণ্ডপে আসিয়া দিনপঞ্জিকা শ্রবণ করিয়া, পূর্ব্বদিনের আয় ব্যয়ের হিসাব লইয়া, ব্রাহ্মণদিগকে নিত্য ভিক্ষা প্রদান করিয়া এবং পূজা লইয়া প্রস্থান করিবেন। আমরা তাহা দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে তথায় দণ্ডায়মান থাকিলাম। পরে দেখিলাম মণ্ডপে একখানি সিংহাসন পাতা হইল, চারি জন ব্রাহ্মণবাহক স্কন্ধে কাষ্ঠাসনে পিত্তলময়ী ভোগমূর্ত্তি আনিয়া উপস্থিত হইলেন; পরে সেই মূর্ত্তি কাষ্ঠাসন হইতে সিংহাসন বসান হইল। তৎপরে অভিষেকাদি কার্য্য সম্পন্ন হইলে একজন ব্রাহ্মণ পঞ্জিকা হস্তে আসিয়া পাঠ করিয়া শুনাইলে আর একজন ব্রাহ্মণ আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করিয়া শুনাইলেন; তাহার পর অন্য এক ব্রাহ্মণ একটি ধামায় করিয়া সের পনর আন্দাজ তণ্ডুল আনিয়া দেবের সম্মুখে রাখিয়া কয়েকটি মন্ত্র পাঠ করিয়া উপস্থিত কয়েকটি ব্রাহ্মণকে এক এক হাতা উঠাইয়া দিলেন, অমনি আর একজন ব্রাহ্মণ একটি পাত্রে করিয়া কিছু তিলের মিষ্টান্ন আনিয়া ভোগ অর্পণ করিলেন ও সেই মিষ্টান্ন উপস্থিত লোকদিগকে বিতরণ করিলেন। তদনন্তর ব্রাহ্মণবাহক আসিয়া দেবকে পূর্ব্ববৎ কাষ্ঠাসনে উপবেশন করাইয়া ভিতরে লইয়া গেলেন, শুনিলাম তাহার পর নিত্য খিচুড়ী ভোগ হইবে।

প্রাতে দেবের খিচুড়ী ভোগ হইয়া থাকে, তৎপরে পূজার পর খিচুড়ী, পুরী, অন্ন ও দধিকণ্ডীর ভোগ হইয়া থাকে।

বৈরাগীগণ উক্ত ভোগান্ন প্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগের সংখ্যানু-সারে ভোগ সামগ্রীর কম বেশ হইয়া থাকে।

আমরা দেবের শ্রীপাদপদ্মরেণু ও পিষ্টক প্রসাদ পাইয়া-ছিলাম; বলা বাহুল্য যে, শ্রীপাদপদ্মরেণুর মোড়ায় দেবালয়ের শীল অঙ্কিত ছিল। সময় অভাবে অপর কিছুই দেখিতে সক্ষম হই নাই। সেই দিবসেই তিরুমলয় হইতে নিম্ন তিরুপতিতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। শাস্ত্রানুসারে সমস্ত তীর্থ পরিদর্শন ও তথায় স্নান করা সময় সাপেক্ষ, কিন্তু আমাদিগের তাহা ঘটে নাই।

নিম্ন তিরুপতি নগরটী কথন কথন স্বামীজী গোবিন্দপত্তন নামে অভিহিত হইয়া থাকে; এই সহর হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোহর, ৩ মাইল দক্ষিণে স্থবর্ণমুখী-নদী প্রবাহিত হইতেছে। উত্তরে ১ মাইল দূরে তিরুমলয় পর্ব্বতশ্রেণীর মনোহর শোভা; দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে বহুদূর ব্যাপিয়া অগণন ছোট ছোট পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজ করিতেছে; পূর্ব্বদিকের দৃশ্য আরও মনোহর, বহু দূরে পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। সহরের উত্তরদিকে ১ মাইলের মধ্যে তিরুমলয় শ্রেণীর গায়ে কপিল-তীর্থ নামে জলপ্রপাত রহিয়াছে, বর্ষাকালে এই প্রপাত হইতে যথন জল পড়িতে থাকে, তথন তাহার দৃশ্য যে কি অদ্ভুত হয়, তাহা বর্ণনাতীত, একটির নিম্নে আর একটি, এইরূপে কয়েকটি রহিয়াছে; প্রত্যেক প্রপাত প্রায় ৪০।৫৯ ফুট গভীর হইবে। শেষের প্রপাত একটি পুষ্করিণীতে পড়ে; তাহার একদিকে

পর্ব্বতশ্রেণী ও অপর ধারে গ্রেনাইট পাথরের দ্বারা বাঁধান। প্রত্যেক যাত্রীই তিরুমলয়ে উঠিবার পূর্ব্বে এই তীর্থে অবগাহন করিয়া থাকে। পর্ব্বতের পার্শ্বে একটি প্রস্তরময় হনুমানের মূর্ত্তি আছে, তাহাতে প্রপাতের জল পতিত হয়। যে সকল যাত্রীগণ সন্তরণে দক্ষ তাহারা সন্তরণপূর্ব্বক হনুমানের উপর যাইয়া বসে ও প্রপাতের জলে স্নান করে; এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি দেখিবার উপযুক্ত প্রপাত আছে।

এই সহর অতি প্রাচীন, ইহার পথগুলি অপ্রশস্ত। ১৮৮১ সালের লোকসংখ্যা অনুসারে এখানকার বাসিন্দার ১৩২৩২ জন মাত্র। এখানে ডিপুটী তহসিলদার ও ডিষ্ট্রীক্ট মুন্সেফের আফিস আছে; এ স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১টি দেবালয় বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে গোবিন্দস্বামী ও রামস্বামীর দেবালয় প্রসিদ্ধ। আমরা উভয় দেবালয়েই যাইয়া দেবদর্শন করিয়াছিলাম।

রামস্বামীর মন্দিরের গোপুর অতি উচ্চ ও পরিষ্কার। লোকে কহিয়া থাকে যে, গোবিন্দস্বামী ব্যঙ্কটেশস্বামীর জ্যেষ্ঠ সহোদর, কিন্তু ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। তবে এইমাত্র দেখিলাম যে, বিষ্ণুমূর্ত্তিটি বৃহৎ ও শেষশয্যায় অর্দ্ধশায়িত।

নিম্ন তিরুপতি হইতে ছয় মাইল পশ্চিমে চন্দ্রগিরি নামক একটী প্রাচীন সহর; চোলরাজগণ এক সময়ে একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে উহা বিজয়নগরের রাজাদিগের অধীনে আইসে। ১৬৪৯ খৃঃ পূর্ব্বভারত-সমিতি, চন্দ্রগিরির রাজা শ্রীরঙ্গরায়ালুর নিকট হইতে

মান্দ্রাজের বন্দর স্থাপনের সনন্দ পাইয়াছিলেন ; তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, তখনও চন্দ্রগিরির রাজগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন ও তাহাদিগের রাজত্ব বর্ত্তমান মান্দ্রাজ সহর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন আর সে রাজাও নাই, আর সে রাজধানীও নাই। রাজভবনের এক অংশ মাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাও দেখিবার উপযুক্ত। এই চন্দ্রগিরিতে বিম্বপুর গুণ্টাকুল রেলের একটি ষ্টেশন হইয়াছে।

আমরা রেলষ্টেশনে রাত্রিযাপন করিয়া পর দিবস প্রাতে ব্যালেষ্টট্রেণে স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হই।

বেল্লুর।

১৮৯০ সালে ৩১শে জুলাই অপরাহ্নে বেল্লুর দর্শনাভিপ্রায়ে যাত্রা করি। ইহার অপর নাম রায়বেল্লুর। ইহা অরুকড্ জেলার একটি প্রধান নগর ও মাদ্রাজ রেলওয়ের কাটপাডি ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এথানকার দুর্গ ও দুর্গ-স্থিত দেবালয় দেখিবার উপযুক্ত, এতদ্ভিন্ন আর দেখিবার উপযুক্ত কিছুই নাই।

প্রবাদানুসারে বোম্মিরেড্ডী নামক জনৈক, ১১৯৫ খৃঃ উক্ত দেবালয়ের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়া ১২০৪ খৃঃ সম্পন্ন করেন। গোদাবরীতীরস্থ ভদ্রাচল নামক স্থানে তাঁহার পূর্ব্ব-নিবাস ছিল; তাঁহার পিতার নাম যাদবরেড্ডী। বোম্মি ও তাঁহার ভ্রাতা তিম্মীরেড্ডী বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দেশত্যাগ করিয়া রামেশ্বরাভিমুখে যাইতে-ছিলেন। পদব্রজে আসিতে আসিতে তাঁহার ক্লান্তিবোধ হইলে, বিশ্রাম করিবার জন্য বেলপদি নামক স্থানে অবস্থিতি করিলেন; তাঁহারা উক্ত স্থান উর্ব্বরা দেখিয়া কৈলাপত্তন নামক স্থানের শাসনকর্ত্তা করিকাল চোলের অনুমতি লইয়া গৃহ-নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে থাকেন।

তাঁহারা প্রথমে পশুপালকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে বর্দ্ধিষ্ঠ হইয়া উঠেন। বোম্মিরেড্ডীর একটী গাভীর পাঁচটী বাঁট ছিল, সেই গাভী প্রত্যহ একটি জলবেষ্টিত দ্বীপ মধ্যে বল্মীক ঢিপির নিকট যাইত এবং তথায় পঞ্চমুখবিশিষ্ট একটি সর্প সেই গাভীর দুগ্ধ পান করিত; সুতরাং উক্ত গাভী ফিরিয়া আসিয়া আর পুনরায় দুগ্ধ দিত না। বোম্মিরেড্ডী উহার কারণ জানিবার জন্য এক দিবস সেই গাভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, পরে স্বয়ং উক্ত ব্যাপার দেখে; সেই রাত্রিতেই সর্ব্বব্যাপী মহাদেব তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দেন ও আদেশ করেন যে, নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গুপ্তধন আছে, তুমি তাহা লইয়া দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দাও। পর দিবস বোম্মিরেড্ডী নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া প্রভূত ধন ও একটি লিঙ্গ দেখিতে পান, তখন আকাশবাণী হইল যে, তিনি দৈনিক খরচ মত প্রত্যহ ধন লইবেন। তাঁহার সঙ্গে একটি কুক্কুর ছিল, তথা হইতে ফিরিবার সময়ে উক্ত কুক্কুর একটি খরগোসকে তাড়া করিলে, খরগোস স্বভাববশতঃ পলাইবার চেষ্টায় দ্বীপস্থ বল্মীক ঢিপির চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিতেছিল, তৎকালে আকাশবাণী হইল যে, যে স্থান দিয়া খরগোস গিয়াছে সেই স্থান পরিমাণে দেবালয় নির্ম্মাণ হউক। বোম্মিরেড্ডী ভগবানের আদেশমত ৯ বৎসরে দেবালয়ের কার্য্য শেষ করিয়া, তথায় সেই লিঙ্গ স্থাপন করিলেন, সেই বিগ্রহ জলকান্তীশ্বর নামে অভিহিত হইল।

যে ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে উক্ত মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য হইয়া-

ছিল, তাঁহার পুত্র পিতার অন্বেষণে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়; সে ব্যক্তি দেবালয়ের কার্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল, আর কহিয়াছিল যে, কুলগ্নে দেবালয়ের পত্তন হইয়াছে, অতএব দেবালয়ের অনিষ্ট হইবে ও দেবসেবার বাধা পড়িবে। তৎপরে শুভলগ্ন দেখিয়া দেবালয়ের পত্তন হইল। ১২৬১ খৃঃ, দেবালয়ের কার্য্য সম্পন্ন হইলে জলকান্তীশ্বর বোম্মিরেড্ডীকে স্বপ্নে আদেশ করেন যে, "তুমি সত্বর দেবালয় ও দুর্গস্থানীয় রাজাকে সমর্পণ কর।" বোম্মি দেবের আদেশমত দুর্গ ও মন্দির স্থানীয় রাজা ব্যঙ্কটদেব রায়ালুকে সমর্পণ করিলেন।

স্থানীয় হস্তলিপিপাঠে জানা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত রাজার বংশধরগণ ১৫০৬ খৃঃ পর্য্যন্ত এই স্থানে রাজত্ব করেন। পরে বিজয়নগরের কৃষ্ণরায়ালু উক্ত দুর্গ অধিকার করিয়া দুর্গস্থ শিবালয়ের কল্যাণমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১৬৪৬ খৃঃ, তালিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগরের ধ্বংস হইলে রায়বংশীয় রাজগণ প্রথমে পেন্নকন্দ থাকিয়া পরে বেল্লুরে আসিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। নরসিংহ রায়ালু রাজপদে অভিষিক্ত হইলে জিঞ্জী, তঞ্জাবুর, মধুরাপুরী ও মহিসুরের হিন্দুরাজগণ তাঁহার সার্ব্বভৌমত্ব নামমাত্র স্বীকার করিতেন। ১৬৫৩ খৃঃ মধুরার তিরুমল নায়কের ষড়যন্ত্রে গোলকন্দার সুলতান আবদুল বাদশা তাঁহাকে পরাভূত করিলে প্রথম তিনি তঞ্জাবুর-রাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া মহিসুর-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মহিসুর-রাজের সাহায্যে

কর্ণাটিক প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বেল্লুর প্রভৃতি কয়েকটি স্থান অধিকার করিয়া গোলকন্দার সুবাদার সেনাকে পরাভূত করেন। কিছু দিন পরে তিরুমলের উত্তেজনায় গোলকন্দার সুবাদার মহিসুর আক্রমণ করিয়া মহিসুর-রাজকে পরাজয় করিয়া রায়ার বংশীয় নরসিংহ রায়াকে বেল্লুর হইতে দূর করিয়া উহা মুসলমান শাসনভুক্ত করেন। তদবধি বেল্লুরের হিন্দুশাসন একেবারে লুপ্ত হয় ও জলকান্তীশ্বর অন্তর্দ্ধ্যান হয়েন।

১৭৭৬ খৃঃ পর্য্যন্ত গোলকন্দার অধীন মুসলমান শাসনকর্ত্তা বেল্লুরে থাকিতেন। ১৬৭৮ খৃঃ মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবজী ১২ মাস অবরোধের পর দুর্গ অধিকার করিয়া দেবের পুনঃস্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিগ্রহের দর্শন পান নাই। শিবজী প্রস্থান করিলে গোলকন্দার সুলতান্ পুনরায় উহা দখল করিয়া লয়েন। ১৭৪০ খৃঃ রঘুজী ভংশ্লে বেল্লুরের নিকট আলিকে পরাভূত করেন, কিন্তু তাহার পুত্রের নিকট নগদ টাকা লইয়া প্রস্থান করেন। সেই অবধি বেল্লুর কখন মহারাষ্ট্রীয় ও কখন বা মুসলমান নবাবদিগের অধীনে থাকে। হাইদার-আলির সময়ে উহা মহিসুর-রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। হাইদারের নিকট হইতে ইংরাজরাজ তাহা কাড়িয়া লয়েন ও সেই অবধি উহা ইংরাজশাসনাধীনে আছে।

আমি বরাবর দুর্গ ভিতরে যাইয়া দেখিলাম যে, দুর্গস্থ প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব-উত্তর দিকে দেবালয় অবস্থিত, সম্মুখে উত্তম সুবৃহৎ গোপুর, গোপুরের ভিতর দিয়া দেবালয় প্রাঙ্গণে

আসিতে হয়। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে কল্যাণ (বিবাহ)-মণ্ডপ, এই সুন্দর মণ্ডপ কৃষ্ণদেব রায়ালু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এই মণ্ডপের কার্য্য অতি উত্তম ও পরিষ্কৃত; ইহার থামে উত্তম উত্তম মূর্ত্তি খোদিত আছে, কার্ণিস ও ছাদ আবরণ প্রস্তরের উপর অতি পরিপাটী সুচারু কারুকার্য্য, এমন অন্যত্র প্রায় দেখা যায় না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং এই কল্যাণমণ্ডপ ভাঙ্গিয়া বিলাতে পাঠাইবার কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম কোণে সভা-মণ্ডপ, পূর্ব্ব-উত্তর কোণে যাত্রামণ্ডপ, মধ্যস্থলে দেবালয়; কল্যাণমণ্ডপের ন্যায় দেবালয়ের কার্য্য তত পরিষ্কার না হইলেও উহা দেখিবার উপযুক্ত।

ইংরাজরাজ, হাইদার-আলির নিকট হইতে দুর্গ দখল করিয়া লওয়া অবধি বেল্লুরে সৈন্যনিবাস স্থাপন করিয়া ছিলেন, এমন কি মহিসুর-যুদ্ধের সময় মান্দ্রাজের পরই বেল্লুর ইংরাজ সৈন্যনিবাসের প্রধান আড্ডা ছিল; এক্ষণে এখানে সৈন্য না থাকিলেও সেনা থাকিবার পুরাতন বাটী সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানকার জলবায়ু বড় স্বাস্থ্যকর; অনেক পেন্-শন্‌ভোগী য়ুরোপীয় ও সিপাহী এই সহরে বাস করিতেছে। দুর্গের চারিদিকে সুগভীর প্রশস্ত গড়খাই; গড়খাই পালার নদীর সহিত ভূগর্ভস্থ জলপ্রণালী দ্বারা সংযোজিত। অতএব পালার নদীর জল বাড়িলে গড়খাইয়ের জল বাড়িয়া থাকে, আবার গড়খাই দেবালয়ের মূলস্থানের সহিত যোগ থাকায়

গড়খাইর জল বাড়িলে দেবালয়ের অঙ্গণে জল আসিয়া থাকে। মূলস্থানের সহিত ৩ দিকে ৩টি পাকা জলপ্রণালী দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১মটি গড়খাই দিয়া পূর্ব্বোক্ত পালার নদীতে গিয়াছে, ২য়টি বিরিঞ্চিপুরের মন্দিরের সহিত যোগ আছে বলিয়া কথিত হয়; ৩য়টি সূর্য্যগুণ্টা নামে বৃহৎ পুষ্করিণীর সহিত যোগ আছে, দক্ষিণদেশে যতগুলি দুর্গ ছিল, তাহার মধ্যে এই দুর্গ সুদৃঢ়তম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এখানকার সেরেস্তাদার ব্যঙ্কট রায় আইয়ার মহাশয় স্বয়ং আমাদিগের সঙ্গে থাকিয়া দুর্গ ও দেবালয়ের সমস্ত স্থান দেখাইয়া ছিলেন।

গত ১৮৮১ খৃঃ লোকসংখ্যার তালিকায় জানা যায় এখানে ৩৭ হাজার লোক বাস করিত। পূর্ব্বে এই দেবালয়ের প্রাঙ্গণে কমিসেরিয়েট গুদাম ছিল; মাদ্রাজ গবর্ণর ডিউক অব্ বকিংহম্ সাহেব এই মন্দিরের কার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হন ও তথা হইতে গুদাম উঠাইয়া দিয়া প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিয়া, আদর্শ স্থানস্বরূপ রাখিতে আদেশ দেন; সেই অবধি প্রাঙ্গণ পরিষ্কৃত আছে।

হাইদার-আলির অধিকার সময়ে দুর্গ মধ্যে অনেকগুলি বাটী নির্ম্মাণ হইয়াছিল। ১৭৮২ খৃঃ টিপুর সহিত সন্ধি হইলে, তাঁহার সন্তানদিগকে এই স্থানে রাখা হয়। ১৭৯৯ খৃঃ টিপুর মৃত্যু হইলে তাঁহার অন্যান্য পুত্র ও বেগম্‌দিগকে এই স্থানে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। ১৮০৬ খৃঃ দেশীয় সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইলে টিপুর বংশধরদিগকে কলিকাতা রাজধানীর টালিগঞ্জ নামক স্থানে পাঠান হইয়াছিল। ১৮৩৮ খৃঃ বেল্লুরে

আর একবার সৈন্যবিপ্লব হইয়াছিল, কিন্তু সহজে থামিয়া যায়। ১৮৬৯ খৃঃ ওহাবিগণ কর্ত্তৃক পুনরায় আর একটি সৈন্যবিপ্লব হইবার উপক্রম হইয়া উঠে, কিন্তু তাহাও সহজে মিটিয়া যায়।

এক্ষণে দুর্গস্থ রাজপ্রাসাদে কয়েকটী সিংহলী ও অন্যান্য রাজপরিবার বাস করিতেছে। বেল্লুর, বিল্বপুর-গণ্টাকুল রেল-ওয়ের একটি ষ্টেশন, দুর্গ ষ্টেশনের সন্নিকটে হইয়াছে। মান্দ্রাজ রেলওয়ের কাটপাড়ী ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিয়া এই স্থানে নামিতে হইবে।

বিরিঞ্চিপুর।

১৮৯০ সালের ১লা অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে জুট্‌কা করিয়া বিরিঞ্চিপুরাভিমুখে যাই, ইহাও পালার নদীর দক্ষিণ তীরে। মান্দ্রাজ রেলওয়ের বিরিঞ্চিপুর ষ্টেশন হইতে সহর ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ভগবান্ মহাদেব মুরগেধারীশ্বরের মন্দির বিরাজমান, এই সহর বিরিঞ্চিপুর নামে অভিহিত হইলেও এখানে ব্রহ্মার কোন মন্দির নাই; তবে ব্রহ্মা পুরাকালে কাঞ্চীপুরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞশালার উত্তর সীমা নারায়ণবন, দক্ষিণ সীমা টিণ্ডীবন, পশ্চিম সীমা বিরিঞ্চিপুর, পূর্ব্ব সীমা চিঙ্গলপুতের দুর্গ হইতে ১৮ মাইল সমুদ্রতীর মহাবলীপুর নামক স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; পিতামহ যজ্ঞের চতুঃসীমা রক্ষার্থ শক্তিদেবীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, অতএব পদ্মযোনির প্রার্থনানুসারে শক্তিদেবী আসিয়া বিরিঞ্চিপুরের সীমা রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ থাকিলেও এখানে শক্তিদেবীর মন্দির বা পূজাপদ্ধতি কিছুই দেখিলাম না।

পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের বিষয় যত দূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় মন্দিরটি অতি পুরাকাল হইতে বিদ্যমান আছে। মূলস্থান চোলরাজাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া

প্রবাদ আছে। বল্লীকুম্ভ রায়ার নামে কোন রাজা ভিতরের প্রাঙ্গণ ও মহামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বীরগম্ভীর রায়ার নামে অন্য কোন রাজা শতস্তম্ভ মণ্ডপ ও পূর্ব্বদিকের গোপুর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বেল্লুরের বোম্মিরেড্ডী ও তাহার পুত্রদ্বয় যে তিনটী মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তাহা অদ্যাপি তাহাদের নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। বোম্মিমণ্ডপ পূর্ব্ব দ্বারের নিকট, আক্কাপ্পমণ্ডপ প্রাঙ্গণের দক্ষিণদিকে ও লিঙ্গপ্পমণ্ডপ প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে অবস্থিত।

বাহির প্রকোষ্ঠের প্রাচীর-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে, ধনপালুকোটী নামে কোন বণিক মরিচ বিক্রয় করিবার জন্য কাঞ্চীপুরে যাইতে যাইতে মানসিক করেন যে, তিনি নিরাপদে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিলে দশবস্তা মরিচের মূল্যে বিরিঞ্চিপুরস্থিত মহাদেবের মন্দিরের সংস্কার করিয়া দিবেন, পথিমধ্যে একদল লুণ্ঠনকারী আসিয়া উক্ত বণিককে আক্রমণ করিলে মহাদেব অশ্বারূঢ় হইয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, কাঞ্চীপুরে পৌঁছিলে তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবার বাসনা হইয়াছিল। পরে বস্তা খুলিয়া দেখিল, মরিচের পরিবর্ত্তে ছোলা রহিয়াছে, তখন ধূর্ত্ত বণিক অনুতাপ করিয়া পুনঃ মানসিক করিলে তাহা পুনরায় মরিচরূপে পরিণত হইল। উক্ত বণিক প্রত্যাবর্ত্তনকালে বিরিঞ্চিপুরে আসিয়া মহাদেবের মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণের প্রাচীর তৈয়ার করিয়া দেন, ইহাতে তিনটি দরজা ও একটি গোপুর আছে, পূর্ব্বদিগের

গোপুর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, বিজয়নগরের রাজা অচ্যুত রায়ালু উক্ত গোপুর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পশ্চিম দিকের গোপুর তদপেক্ষা ছোট। উক্ত দিকের দরজার সম্মুখে ভিতরের দেওয়ালের যে স্থান আছে, তথায় বসন্ত উৎসব হইয়া থাকে। প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে একটি তীর্থ আছে; যে সকল স্ত্রী বন্ধ্যা অথবা ব্রহ্মদৈত্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, প্রবাদ এইরূপ তাহারা ঐ তীর্থে স্নান করিলে আরোগ্য লাভ করেন। উত্তর দিকে যে তীর্থ আছে, তাহা সাধারণ-তীর্থ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শতস্তম্ভ মণ্ডপে মহাদেবের বাৎসরিক কল্যাণ উৎসব হইয়া থাকে। মন্দিরের ব্যয় কারণ কলেক্টর হইতে বাৎসরিক ১৬ শত টাকা ধার্য্য আছে, আমরা মন্দির দর্শনানন্তর ঈশ্বরের অর্চ্চনাদি কার্য্য সমাপন করি।

আগন্তুকদিগের থাকিবার নিমিত্ত এই স্থানে অনেকগুলি ছত্র বা ধর্ম্মশালা আছে। এখানকার জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর এবং ব্রাহ্মণেরা স্মার্ত্ত, এখানে চৈত্রমাসে ব্রহ্মোৎসব কালীন অনেক লোক সমবেত হইয়া থাকে।

হাইদার-আলি কর্ত্তৃক বেলুর অবরুদ্ধ হইবার সময় ইহা মহিসুর সেনাদিগের একটি আউট্-পোষ্ট ছিল। এই সহরে তিন হাজার লোকের বাস।

তদনন্তর আমরা বিরিঞ্চিপুর হইতে আহারাদি সমাপন করিয়া পল্লিকোণ্ডের দিকে অগ্রসর হই।

পল্লিকোণ্ডৈ।

উত্তর অর্ককড্ জেলার বেল্লুর তালুকের অন্তর্গত বিরিঞ্চিপুর সহরের ১৩ মাইল পশ্চিমে বেল্লুর-বেঙ্গলুর-গ্রেণ্ডট্রাঙ্ক রোডের এক মাইল উত্তর দিকে পালার নদীর চরদ্বীপে পল্লিকোণ্ডৈ নামে সহর, ইহার নাম আদিরঙ্গম। এখানে ভগবান্ বিষ্ণু রঙ্গনায়ক স্বামী নামে অভিহিত হইতেছেন।

পুরাকালে ব্রহ্মা কাঞ্চীপুরে একটি যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞ দর্শনে নিমন্ত্রিত অসুরেরা অসন্তুষ্ট হইয়া সরস্বতীদেবীকে সেই সংবাদ দেন, তখন সরস্বতীদেবী ক্রুদ্ধা হইয়া নদীরূপে যজ্ঞাগ্নি নষ্ট করিবার মানসে যজ্ঞশালার দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ব্রহ্মা তাহা জানিতে পারিয়া বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু জলরোধ করিবার মানসে নদীরূপিণী সরস্বতী দেবীর সম্মুখে শয়ন করেন, নদীরূপিণী সরস্বতী দেবীও অন্য দিক্ দিয়া বহিতে থাকেন। তাহা হইতেই সেই স্থানের নাম পল্লিকোণ্ডৈ (অর্থাৎ তুমি শয়ন করিয়া থাক) হইয়াছে। রঙ্গম্ অর্থাৎ জলবেষ্টিত দ্বীপ হইতে এই দ্বীপ আদি-রঙ্গম্ নামে কথিত হইয়া থাকে, সেই কারণে ভগবান্ বিষ্ণু রঙ্গনায়ক স্বামী নামে অভিহিত হইতেছেন। বিষ্ণু জলরোধ করিলে সরস্বতী দেবী অন্তঃশিলা হইয়া কাবেরী পাকের সন্নি-

কটে আবির্ভূত হইয়া যজ্ঞ নাশের উদ্দেশে বহিতে থাকেন। বিষ্ণুও সেই স্থানে যাইয়া জলরোধ করিয়া দেন, তথায় তিনি রঙ্গনাথ স্বামী নামে খ্যাত হইয়াছেন। আমার পথপ্রদর্শক কহিলেন কাঞ্চীপুরের নিকটে বেগবতী নদীর ধারে যে উলঙ্গ মূর্ত্তি আছে, তাহাই অন্তঃরঙ্গনাথ স্বামী জানিবে।

এ সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ আছে যে, পল্লিকোণ্ডৈর নিকটে বিজয়াচলে অম্বরীষ নামক রাজা মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশে অনেক দিন ধরিয়া তপস্যা করিলে আকাশবাণী হইয়াছিল যে, বিষ্ণু সরস্বতীদেবীর বেগ রোধ করিবার জন্য বিজয়াচলের সন্নিকটে শেষশায়ী হইলে তদ্দর্শনে তোমার মুক্তি হইবে। তিনিও বিজয়াচলে থাকিয়া বিষ্ণু দর্শন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ও বিষ্ণুকে শেষশায়ী দেখিয়া মুক্তিলাভ করেন, এই নদী পালার নামে অভিহিত পাল—দুগ্ধ অর—নদী অর্থাৎ দুগ্ধ নদী। এই নদীর জল অতি পরিষ্কার ও সুমিষ্ট বোধ হয় এই কারণেই দুগ্ধ নদী বলিয়া নাম হইয়াছে।

এখানকার মন্দিরটি নিতান্ত ছোট নহে। বাহিরের প্রাচীরে যে গোপুর আছে, তাহাতে দুই একটি কদাকার ও কুৎসিত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, চোলরাজদিগের সময়ে স্থাপিত হয় ও বিজয়নগরের রাজগণ দ্বারা এই মন্দিরের উন্নতিও সংস্কার হইয়া থাকিবে। ইহা শ্রীরামানুজ মতাবলম্বী শ্রীবৈষ্ণবদিগের মন্দির। মন্দিরের যে ভূসম্পত্তি ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে ব্যয় জন্য সরকার হইতে হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। মন্দি-

রের মনিগার সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত দেখাইয়াছিলেন এবং তিনি অর্চ্চনাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ১৮৮১ খৃঃ লোক সংখ্যার তালিকার হিসাবে এখানে ২৪০৫ লোকের বাস।

এখান হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে বটার-বন নামক স্থানে হল্লাম্মা নামক দেবীর মন্দিরে প্রতি শুক্রবার বহুলোক সমবেত হইয়া মন্দিরের সম্মুখে অন্নপাক করিয়া দেবীকে অর্চ্চনাদি ও ভোগ দানের পর আহারাদি করিয়া থাকে, হল্লাম্মার মন্দির দর্শন ও স্বামীর অর্চ্চনাদি করিয়া পুনরায় বেল্লুরে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রিযাপন করিলাম।

তিরুবিল্বম্।

পর দিবস শনিবার প্রাতে তিরুবিল্বম্ নামক স্থানাভিমুখে গমন করি, প্রথম জুট্কাযোগে কাট্পাদী-রেলষ্টেশনে আসি। তথা হইতে রেলগাড়ীযোগে তিরুবিল্বম্ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছি। এই রেলষ্টেশন হইতে দেবালয় এক মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ভগবান্ বিল্বনাথেশ্বর নামে স্বয়ম্ভু অনাদি মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। কথিত আছে যে, সত্যযুগে গৌরীদেবী, ত্রেতায় মহাবিষ্ণু ও দ্বাপরে বিরিঞ্চি এইস্থানে বিল্বনাথেশ্বরের পূজা করিয়াছিলেন। লোকের বিশ্বাস যে, কলিযুগে মতিজনক নামে কোন ঋষি ঐ লিঙ্গের পূজা করিতেন। এই মন্দির হইতে চার মাইল দূরে কাঞ্চিমলয় নামে এক পাহাড়ে একটি উৎকৃষ্ট জলাশয় আছে। পুরাকালে উক্ত জলাশয় ভিন্ন অন্য কোন জলাশয় নিকটে ছিল না। তখন পল্লীনদীর উৎপত্তিও হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত জলাশয়ের সন্নিকটে পণজ্ঞী নামে এক রাক্ষস বাস করিত। মুনিবর মতিজনক তথায় প্রত্যহ জল আনিতে যাইতেন, রাক্ষস তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া কোন প্রকারে মুনিবরের অনিষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইল। বিল্বনাথেশ্বর তাহা জানিতে পারিয়া, ঐ রাক্ষস বধ করিতে নন্দীকে অনুমতি দেন। নন্দীও তথায় যাইয়া ঐ রাক্ষসকে বধ করে। তদবধি

নন্দী বিল্বনাথেশ্বরের দিকে পিছন হইয়া পর্ব্বতের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, যেন অন্য কোন রাক্ষস আসিয়া উপস্থিত না হয়। প্রত্যহ ৪ মাইল দূরে যাইয়া পূজার নিমিত্ত জল আনা মতিজনক-ভক্তের পক্ষে কষ্টকর বুঝিয়া বিল্বনাথেশ্বর দেবালয়ের সম্মুখ দিয়া পোন্নী অর্থাৎ "তুমি এই স্থান দিয়া প্রবাহ হইতে থাক," এই নামে নদীর উৎপত্তি করিয়া দিয়াছেন। এই মন্দির কোন্ সময়ে স্থাপিত হয়, তাহার নিগূঢ়তত্ত্ব জানিবার উপায় নাই। এখানকার গুরুকুল এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা কহেন যে, এই স্থানে বিল্ববন ছিল। সেই বিল্ববন হইতেই বিল্বনাথেশ্বর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহারা আরও কহেন যে, উক্ত ঋষি অদ্যাবধি পূর্ব্বোক্ত কাঞ্চিমলয়ে বাস করিতেছেন। সময়ে সময়ে রাত্রিকালে বিল্বনাথেশ্বরকে পূজা করিতে আসেন। মন্দিরের সম্মুখে কোন বিল্ববৃক্ষ দেখিতে পাইলাম না। একটি পুরাতন কাঁঠাল বৃক্ষ আছে, গুরুকুলগণ কহেন ইহা দুইশত বৎসরের বৃক্ষ।

মন্দির দৃষ্টে পুরাতন বলিয়া বোধ হয়, মন্দিরের চারিদিকে প্রাচীর, দক্ষিণ প্রাচীরের সম্মুখ অপেক্ষাকৃত নূতন, আর একটি প্রাচীর, এই উভয় প্রাচীরেই সুবৃহৎ গোপুর আছে। প্রথম গোপুর পার হইয়া দক্ষিণদিকে গৌরীতীর্থ নামে চতুঃসোম পুষ্করিণী আছে, উহার চারিদিকে গ্রেণাইট প্রস্তরের বাঁধা সিঁড়ি; বামদিকে পুষ্পোদ্যান, দ্বিতীয় গোপুর পার হইলে মন্দির সম্মুখে আসিয়া পৌঁছান যায়।

মন্দিরের পূর্ব্বদিকে যে মূলমণ্ডপ আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত নূতন, প্রাঙ্গণের দক্ষিণকোণে রন্ধনশালা, উত্তর পূর্ব্বকোণে সভাপতির বসন্তমণ্ডপ। পশ্চিম উত্তরকোণে কল্যাণ (বিবাহ)-মণ্ডপ। অনুশাসন দৃষ্টে জানা যায় যে, উক্ত কল্যাণমণ্ডপ ৪২ বৎসর পূর্ব্বে বেল্লুরের সুব্রহ্মণ্য নামক কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। বেদশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সোমশাস্ত্রী এখানে ছাত্রদিগকে মণ্ডপে বসিয়া বেদ অধ্যয়ন করান, তিনি মন্দিরের আয় হইতে মাসিক পাঁচ টাকা হিসাবে বেতন পান। ইনি সঙ্গে থাকিয়া মন্দির দেখাইয়া পূজা ও অর্চ্চনার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

দেবীর মন্দির মূলমন্দিরের পার্শ্বে, দেবীর নাম ধানু-মুদিম্বাল।

অরুকদু।
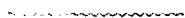
২রা অক্টোবর শনিবার অপরাহ্নে শোলিঙ্গম যাইবার উদ্দেশে তিরুবিল্বম্ রেল-ষ্টেশনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রেলযোগে অরুকদু ষ্টেশনে অবতরণ করিয়াছিলাম।

তামিল ভাষায় অরুকদু নামের উৎপত্তি, অরু=ছয়, কদু=বন সংস্কৃত ষড়ারণ্য ক্ষেত্র, এক্ষণে তাহার অপভ্রংশ অর্কট্।

পুরাকালে এই প্রদেশ জঙ্গলময় ছিল। কাঞ্চীপুরে ব্রহ্মার মহাশ্বমেধযজ্ঞ সমাপন হইলে, ভরদ্বাজ প্রভৃতি ষষ্ঠ ঋষি উক্ত ষষ্ঠীবনে বাস করিতে থাকেন এবং আপন আপন আশ্রমে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করেন; পরে তাঁহাদের আপন আপন নামানুসারে মহাদেবেরও নাম হইয়াছে। সেই পুণ্যস্থানও অরুকদু বা ষড়ারণ্য নামে খ্যাত হইতেছে।

(১) যে স্থানে পালার নদীর আনিকট হইয়াছে, তাহার সন্নিধানে পুবনকাদু (পুষ্পারণ্য) গ্রামে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ছিল, উক্ত মুনি আপন আশ্রমে লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়ছিলেন, সেই লিঙ্গ এক্ষণে তাঁহারই নামে অভিহিত হইতেছেন।

(২) বেপুর (অর্থাৎ নিম্বারণ্য) গ্রামে বশিষ্ঠদেবের আশ্রম ছিল; উক্ত মুনিবর আপন আশ্রমে লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া

তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহারই নামানুসারে মহাদেব বশিষ্ঠেশ্বর নামে অভিহিত হইতেছেন। এখানে রথযাত্রা ও ব্রহ্মোৎসব মহাসমারোহের সহিত সমাধা হইয়া থাকে; এই স্থানের দেবোত্তর ভূসম্পত্তির আয় প্রায় এক হাজার টাকা হইবে।

(৩) অরুকডু ও বেল্লুরের মধ্যস্থলে মেল-বিসরণ গ্রামে বাল্মীকি মুনির আশ্রম ছিল। এ স্থানটি অতি পবিত্র, এইরূপ প্রবাদ যে, এই স্থানে মৃতব্যক্তির অস্থি জলে দিলে তাহা পুষ্প-রূপে পরিণত হইত। এক্ষণে অনেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে এখানকার অস্থি জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

(৪) বালা-জাপেট্ তালুকের অন্তর্গত বল্লিবেডু গ্রামের নিকট অগস্ত্যেশ্বর মহাদেবের মন্দির। অগস্ত্যমুনি আপন আশ্রমে ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠা করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন।

৫।৬ পালার নদীর ধারে যে স্থানে নবলক্ষ বন বা বৃক্ষ আছে, তথায় বিশ্বামিত্র ও গৌতম মুনিদ্বয়ের আশ্রম। উক্ত বনে মহাদেবের ২টি মন্দির ছিল, অরুকডুর নবাবেরা যখন নবলক্ষ উদ্যানের পত্তন করেন, তখন উক্ত মন্দিরদ্বয় তাহা-দিগের স্পর্শে অপবিত্র হয়। এখন বিশ্বামিত্রেশ্বরের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, কিন্তু গৌতমেশ্বরের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

এই বিভাগকে অরুকডু কহিত, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, পূর্ব্বে ইহা হইতেই সহরের নামও অরুকডু বা অর্কট হইয়াছে।

খৃঃ ১১শ শতাব্দিতে তঞ্জাবুরের কুলোত্তুঙ্গ চোলরাজের জারজ পুত্র তণ্ডীমান রাজচক্রবর্ত্তী অরুকড়ু আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া আবাদোপযোগী করিয়াছিলেন। যৎকালে বোম্মিরেড্ডী বেল্লুরের দুর্গ প্রস্তুত করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার ভ্রাতা তিম্মিরেড্ডীও অরুকড়ুর দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অরুকড়ু সম্বন্ধে অন্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যভাগে জিঞ্জী নামক দুর্গে মারী-ভয় উপস্থিত হয়। কর্ণাটিকের নবাবেরা জিঞ্জী পরিত্যাগ করিয়া অরুকড়ুতে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন, তথায় তাহারা নবাব মহম্মদ আলির সময় পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিল। লর্ড ক্লাইব প্রথমে এই স্থানেই আপন বলবিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে অরুকড়ুর পূর্ব্ব গৌরব বা সৌন্দর্য্য নাই। উহা একটি সামান্য সহররূপে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে ৩৬০টি মস্‌জিদ ছিল, তৎকালীন নবাবগণ তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। সহরের চারিদিকে যে উচ্চ প্রাচীর ছিল, তাহা ৫ মাইলের কম নহে; উক্ত প্রাচীর সহরপণা নামে অভিহিত হইত, উহার ভিত্তি ২৪ ফুট চওড়া এবং ক্রমে কমিয়া ১২ফুট প্রশস্ত ছিল, উক্ত প্রাচীরের ৫টি দরজা ছিল, পালার নদীর উপরে যে দরজা তাহা দিল্লীদরজা নামে অভিহিত, এবং এখনো বর্ত্তমান আছে। দরজার উপর হইতে পালার নদীর দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়, ক্লাইব সাহেব উক্ত দরজার উপর প্রায়ই উঠিতেন। প্রত্যক

৫ম বৎসরে পূর্ত্তবিভাগ হইতে উহার মেরামত হইয়া থাকে। পালার নদী হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে ও সহরের মধ্যস্থলে দুর্গ ছিল। ১৭৫১ খৃঃ, উহা লর্ড ক্লাইব কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল। দুর্গ এবং সহরপণা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, দুর্গের সাক্ষী-স্বরূপ একটি মস্‌জিদ বিদ্যমান আছে। এই মস্‌জিদের ২০০ শত গজ অন্তরে নবাবদিগের রাজ-ভবনের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে।

পুরাণ দরবার-গৃহে তালুক কাছারী বসিত, এখন তাহাতে সিবিল ডিস্পেন্‌সারি হইয়াছে, রাজভবন ও জুম্মা-মস্‌জিদের ভিতরে নবাব সাহদৎ-আলিখাঁর কবর বিদ্যমান রহিয়াছে, এই কবর গ্রেণাইট প্রস্তরে প্রস্তুত হইলেও গাঁথুনি ও পালিস যাহা আছে তাহা দেখিবার উপযুক্ত বটে। এই স্থানে টিপু আলিয়ার নামে কোন ফকিরের কবর আছে; নবাবেরা উক্ত ফকিরকে বিশেষ মান্য করিতেন। মহিসুরের হাইদার-আলি উক্ত ফকিরের নাম হইতে আপন প্রিয়পুত্র টিপুসুলতানের নামকরণ করিয়াছিলেন।

বাৎসরিক মহরম উপলক্ষে মান্দ্রাজ ত্রিপিকোলনের নবাব বংশীয়েরা অরুকড্‌তে আসিয়া টিপু আলিয়ারের কবরের নিকট যাইয়া সম্মান প্রদর্শন করেন। মস্‌জিদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ইংরেজ সরকার হইতে বাৎসরিক টাকা বরাদ্দ আছে।

অরুকড্‌র পূর্ব্ব গৌরব না থাকিলেও ঐতিহাসিক গৌরবের জন্য সকলেরই আসিয়া দেখা উচিত।

শোলিঙ্গম্।

শোলিঙ্গম্ বালাজাপেট্ তালুকের অন্তর্গত অরুকন্নু রেল-ষ্টেশন হইতে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা অরুকন্নু হইতে জুট্কাযোগে শোলিঙ্গম্ যাইয়া পৌছি।

এই সহরটি নিতান্ত ছোট নহে। এখানে ৫ পাঁচ হাজার লোকের বাস আছে, চোললিঙ্গপুর হইতে শোলিঙ্গম্ শব্দের উৎপত্তি।

কথিত আছে যে, পূর্ব্বে এই স্থান জঙ্গলময় ছিল। চোল-বংশীয় কোন রাজা মৃগয়া করিতে করিতে এই জঙ্গলমধ্যে অনাদি স্বয়ম্ভুলিঙ্গ দেখিতে পান। পরে লিঙ্গের উপরে এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া উক্ত লিঙ্গকে চোলেশ্বর নামে অভিহিত করেন। তিনি জঙ্গল কাটাইয়া জমী সকল আবাদ করান ও ব্রাহ্মণদিগের বাসের নিমিত্ত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

এই মন্দিরটি সহরের মধ্যস্থলে ও পুরাতন বলিয়া বোধ হইল। সহরের অপরদিকে ভক্তবৎসল নামে একটি বিষ্ণু মন্দিরও আছে।

স্থানীয় প্রবাদানুসারে কাঞ্চীপুরের শ্রীবরদারাজেশ্বর স্বামী এই স্থানের দণ্ডাচার্য্য নামে কোন সিদ্ধপুরুষকে প্রত্যক্ষ হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণের আদেশ করেন। উক্ত

সিদ্ধপুরুষ বিজয়নগরের রাজাদিগের নিকট ভগবানের আদেশ জ্ঞাপন করিলে, তথাকার রাজা কৃষ্ণরায়ালু তাঁহার প্রার্থনামতে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

দণ্ড্যাচার্য্যের ৩০ বৎসর বয়সের সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। ৫৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। তাঁহাদের প্রমুখাৎ শুনিলাম ৩৭০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, সেই হিসাবে ভক্তবৎসলের বয়স ৩৭০ বৎসরের উপর হইতেছে।

সহর হইতে ১ মাইল দূরে পাহাড়ের উপর দুইটি দেবালয় আছে, একটিতে ভগবান্ নৃসিংহস্বামী বিরাজমান, অপরটিতে আঞ্জনেয় স্বামীর মূর্ত্তি বিদ্যমান।

প্রবাদ আছে, ভগবান্ নৃসিংহস্বামীর মন্দিরের সন্নিকটে কশ্যপ, অত্রি, গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও সপ্তর্ষিগণ তপস্যা করিয়াছিলেন। ভগবান্ নৃসিংহস্বামী ঋষিদিগের তপে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নৃসিংহ মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ দেখা দেন। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাদের প্রার্থনায় তদবধি উক্ত পর্ব্বতে নৃসিংহমূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছেন। পর্ব্বতটি উচ্চ, মন্দিরে উঠিবার কারণ পরিষ্কার সিঁড়ি আছে, অরুকচুর নবাব মহম্মদ আলির মন্ত্রী রাওজী উক্ত পর্ব্বতের সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিয়া দেন; অতএব এক্ষণে মন্দিরে উঠিতে বিশেষ কষ্ট হয় না, পাহাড়ের দশ আনা ভাগ উঠিলে রাস্তার দক্ষিণ ভাগে একটি

মন্দির আছে, তাহা অমৃত বল্লীম্মার মন্দির নামে খ্যাত ; কিন্তু এক্ষণে ঈশ্বরীমাতার মূর্ত্তি নৃসিংহদেবের মন্দিরের এক পার্শ্বে রহিয়াছে, বোধ হয়, মুসলমান অত্যাচারের ভয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থানে রাখা হইয়াছে। মন্দিরটি আপাততঃ অতি অপরিষ্কার, পরিষ্কার করাইয়া রাখিলে উত্তম বিশ্রামের স্থান হইতে পারে। এখানে ছয়টি তীর্থ আছে, তাহাদের জল অতি পরিষ্কার বলিয়া বোধ হইল।

পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে নৃসিংহদেবের মন্দির। এখান হইতে চারি দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, দৃশ্যও বড় সুন্দর, তথায় সর্ব্বদা শীতল বায়ু বহিতেছে, মন্দিরের গোপুরের সম্মুখে একটি তীর্থ আছে, তাহা হংসকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। মন্দিরের অপরপার্শ্বে আর একটি কুণ্ড আছে, তাহার জল অতি সুমিষ্ট।

নৃসিংহমূর্ত্তির অবয়ব মনুষ্যাকৃতি মুখ সিংহাকৃতি চতুর্হস্ত, দুই হস্তে শঙ্খ-চক্র অপর দুই হস্তে গদা-পদ্ম, যোগাসনে উপবিষ্ট, নৃসিংহদেবের মন্দিরের পার্শ্বে একটি ছোট প্রকোষ্ঠে অমৃতবল্লী-ম্মাদেবী বিরাজ করিতেছেন। অমৃতবল্লীম্মাদেবীর নাম সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়া থাকে যে, কোন সময় কুবেরের নবনিধি অপহৃত হয়, কুবের তাহার পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত উক্ত শৈলে আসিয়া মহালক্ষ্মীর তপস্যা করিতে থাকেন। যে স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার নিকট একটি অমৃতবল্লীর গাছ ছিল। লক্ষ্মীদেবী তাঁহার (কুবেরের) দুঃখে দুঃখিত হইয়া উক্ত বৃক্ষ

হইতে কুবেরকে দর্শন দিয়াছিলেন। কুবের সেই নিমিত্ত অমৃতবল্লী বৃক্ষের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া মন্দিরে লক্ষ্মী-দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া উক্ত অমৃতবল্লীবৃক্ষ হইতে মাতার নামকরণ ও পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

নৃসিংহদেবের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ, যাঁহারা কাঞ্চীপুর ও তিরুপতি আসিয়া দেবদর্শন করেন, তাঁহারা শোলিঙ্গম্ আসিয়া নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি দেখিয়া চরিতার্থ হয়েন[১]।

পর্ব্বতের নীচে যে বৃহৎ প্রস্তরে পাকা বাঁধান পুষ্করিণী আছে, তাহা নৃসিংহতীর্থ নামে খ্যাত, এই তীর্থের পূর্ব্বভাগে অন্নদান ছত্র আছে। এই ছত্রটি পূর্ব্বোক্ত রায়জীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্মশালার ব্যয়ার্থ তিনি যে ভূমিদান করিয়াছিলেন; ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার পরিবর্ত্তে বাৎসরিক ১২৮০৲ টাকা নির্দ্ধারিত আছে। লোক্যালফণ্ডের তত্ত্বাবধানে এই টাকা হইতে আগন্তুক ব্রাহ্মণদিগকে আহার দেওয়া হয়। আঞ্জনেয়স্বামীর মন্দিরে যাইবার কারণ ছত্রের নিকট দিয়া নূতন পথ প্রস্তুত হইয়াছে। আঞ্জনেয় পাহাড়ের পাদদেশে একটি চতুষ্কোণ বাঁধান পুষ্করিণী; ইহার একধারে রামস্বামীর মন্দির। এই পুষ্করিণীর ধার দিয়া আঞ্জনেয় পাহাড়ে উঠিতে হয়, পাহাড়ের উপর আঞ্জনেয়স্বামীর মন্দির। পাহাড়

---

(১) মন্দিরের আভরণাদির মূল্য কম নহে। দুইমাস পরে শুনিলাম যে ৪০ চাল্লিশহাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার তস্করেরা রাত্রিযোগে দরজা ভাঙ্গিয়া হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

স্থিত নৃসিংহস্বামীর মন্দির হইতে ইহা অর্দ্ধমাইল দূরে অবস্থিত এবং ইহাতে উঠিবার সিঁড়ি পূর্ব্ব হইতেই কতক ছিল, অবশিষ্ট-গুলি মন্ত্রিবর রায়জী উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করিয়া দেন। আঞ্জনেয়-স্বামীর মূর্ত্তি নৃসিংহদেবের মূর্ত্তির সদৃশ চতুর্হস্ত-বিশিষ্ট, হস্তে শঙ্খ-চক্র বিরাজমান। প্রবাদ আছে যে, শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর আঞ্জনেয় এই শৈলে আসিয়া নৃসিংহদেবের তপস্যায় রত থাকেন, সেই সময়ে মান্দারপুরের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন একদিবস মৃগয়া করিতে যান, তিনি জাতিস্মর ছিলেন। বনে যাইতে যাইতে শুনিতে পাইলেন, পশুগণ পরস্পর কহিতেছে যে দেখ, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন আমাদের রক্ষাকর্ত্তা হইলেও আমাদিগকে সংহার করিতে আসিতেছেন, এখন আমরা কোথায় যাই ও কাহার বা আশ্রয় লই; অহো কি দুর্ভাগ্য! যিনি রক্ষক তিনিই ভক্ষক। পশুদিগের সেই কাতরোক্তি শ্রবণে রাজার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কোথায় রাজা হইয়া সকলের কষ্টদূর করিব, না প্রাণীহিংসা করিতে প্রবৃত্ত হই-য়াছি। প্রায়শ্চিত্ত কি? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাজ্যত্যাগ করণান্তর সন্ন্যাসগ্রহণের নিমিত্ত বামদেব ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া বনে মৃগয়াকালীন যাহা যাহা ঘটিয়া-ছিল, তৎসমস্ত বিবৃত করিয়া কহিলেন; প্রভো! আমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? তৎবিষয়ে উপদেশ দিন। তৎশ্রবণে ঋষিবর তাঁহাকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া আদেশ করিলেন, যে তুমি শোলিঙ্গপাহাড়ে যাইয়া নৃসিংহদেবের আরাধনা করিলে

তোমার মানস পূর্ণ হইবে। এই সময় কালকেয়াদি কয়েকটি দৈত্য ঋষিদিগের তপের বিঘ্ন করিতেছিল, ঋষিগণ নৃসিংহ-দেবকে আপন আপন দুঃখ জানাইলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ঐ সময় সেই পর্ব্বতে আসিয়া পৌছেন। রাজা আসিয়া পৌছিলে নৃসিংহদেব তাঁহাকে কালকেয় দৈত্যদিগকে বধ করিতে অনুমতি দিলেন। তৎশ্রবণে রাজা প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, পশুহিংসা পাপে লিপ্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত জন্য রাজ্য ত্যাগ করিয়াছি ও আপনার তপস্যার্থ এইস্থানে আসিতেছি। আমার রথ বা সৈন্য-সামন্ত আর কিছু নাই, কেমন করিয়া দৈত্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিব। দেব! আমি পরহিংসা করিতে ইচ্ছুক নহি। তখন নৃসিংহদেব নিষ্কাম ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া রাজাকে কহিলেন, তুমি ঋষিদিগের মঙ্গল কামনায় ও আমার আদেশে এই কার্য্য সম্পন্ন করিলে প্রাণীহিংসাজনিত পাপ তোমায় স্পর্শ করিতে পরিবে না। দেবেন্দ্রের রথ তোমার নিকট আসিবে; সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধে গমন কর। আঞ্জনেয়কেও বলিয়া দিতেছি, তোমার সঙ্গে যাইয়া সাহায্য করিবে। নৃসিংহদেব তখন আঞ্জ-নেয়কে কহিলেন যে, তুমি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত যাইয়া দৈত্যদমনের সাহায্য কর। আঞ্জনেয় কহিলেন, প্রভো! এক্ষণে আমার বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত, আমার বল-বিক্রম প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সকলই গিয়াছে; এই অবস্থায় কি করিয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব, তদ্বিষয়ে আদেশ করুন। নৃসিংহদেব কহিলেন, বৎস আঞ্জনেয়! যাহা কহিতেছ তাহা সকলই সত্য, কিছুই

আমার অগোচর নাই, দৈত্যগণ বড় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে; ব্রাহ্মণেরা হোমযাগাদি কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছেন না; তাহাদিগকে দমন করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। অতএব তুমি আমার শঙ্খ চক্র লইয়া যুদ্ধে গমন কর; আমার কৃপায় তুমি যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। তখন আঞ্জনেয় হৃষ্টচিত্তে শঙ্খ চক্রধারণে বলবান্ হইয়া মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের অনুসরণ করিলেন; রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ও আঞ্জনেয় উভয়ে দৈত্যদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের প্রধান কয়েকটিকে সংহার করিলে সকল দৈত্য ভয়ে পাতালে প্রবেশ করিল। তখন আঞ্জনেয় একটি বৃহৎ পর্ব্বত লইয়া পাতালগমনের দ্বারে রাখিয়া দিল। এই রূপে ঋষিদিগের আশ্রমে উপদ্রবশূন্য হইলে, আঞ্জনেয় শঙ্খচক্র প্রত্যার্পণ মানসে নৃসিংহদেব স্বামীর সকাশে গমন করিলেন; নৃসিংহদেব তাহাকে আগত দেখিয়া প্রফুল্লমনে কহিলেন, বৎস আঞ্জনেয়! তুমি আমার পরম ভক্ত, আমি তোমার কার্য্যে পরম পরিতুষ্ট হইলাম। রাম অবতারে সীতার উদ্ধারের জন্য প্রধান সহায়তা করিয়াছিলে, তদনন্তর বহু দিবস পর্য্যন্ত আমার তপস্যা করিয়াছ, এখন আমার এই প্রীতিকর কার্য্য করিলে। পূর্ব্বেই তুমি অমরত্ব লাভ করিয়াছ; এক্ষণে আমার স্বারূপ্য মূর্ত্তি লাভ করিয়া শঙ্খচক্রধারী হইয়া বিরাজমান থাক। তোমাকে আর উক্ত শঙ্খচক্র আমাকে অর্পণ করিতে হইবে না। তখন আঞ্জনেয় নৃসিংহদেবের কৃপায় তাঁহার স্বরূপ মূর্ত্তি পাইয়া, পূর্ব্বে যেখানে তপস্যা করিয়াছিলেন, নৃসিংহদেবের

অনুমতিক্রমে তথায় যোগাসনে বিরাজ করিতেছেন, রাজা ইন্দ্র-দ্যুম্ন নৃসিংহদেবের কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

প্রতি রবিবারে আঞ্জনেয়দেবের মন্দিরে অভিষেক হইয়া থাকে। অনেক দূর দেশান্তর হইতে যাত্রীগণ আসিয়া অর্চ্চনাদি করে। যে সকল স্ত্রীলোক ব্রহ্মদৈত্য দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহারা ঐ মন্দিরের প্রাঙ্গণে যাইয়া মধ্যস্থলের কুণ্ডে স্নান করিয়া মন্দি-রের মণ্ডপে যাইয়া আঞ্জনেয় দেবকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। তদনন্তর আঞ্জনেয়দেবের সম্মুখীন হইয়া মণ্ডপে বসিয়া তাঁহার নামে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দুই হাঁটুর উপর ভর দিয়া উপবেশন করে, তৎপরে মস্তক একবার ভূমির কাছে নত করিয়া পরক্ষণে সমান হইয়া কোমরের উপরাংশ দোলাইতে থাকে, এইরূপে এক ঘণ্টা হইতে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত দোলাইতে দোলাইতে অচেতন হইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্টভাবে মস্তক অবনত করিয়া পড়িয়া থাকে; তৎপরে অর্চ্চকগণ আঞ্জনেয়দেবের চরণামৃত আনিয়া তাহাদের গাত্রে ছিটাইয়া দিলে তাহারা সংজ্ঞালাভ করিয়া সুস্থ হয়। ব্রহ্মদৈত্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করে। আরও শুনা যায় যে, অন্যান্য দুঃসাধ্য পীড়া হইতেও অনেকে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

রবিবার প্রাতে ৯টার সময় আঞ্জনেয়দেব দর্শন করিতে গিয়া দেখিলাম ৩টী স্ত্রীলোক আঞ্জনেয় স্বামীর নামোচ্চারণ করিতে করিতে দুলিতেছে, আর কয়েকটী প্রদক্ষিণ করিতেছে।

শোলিঙ্গম্ কার্বেথ জমিদারির অন্তর্গত জমিদারের নিকট হইতে দেবসেবার নিমিত্ত ১২০০৲ টাকা বরাদ্দ আছে এবং দেবোত্তর ভূসম্পত্তি হইতে ১ হাজার টাকা বরাদ্দ আছে। শোলিঙ্গম্ ষ্টেশন হইতে যে পাকা রাস্তা আসিয়াছে, তাহার বাম ভাগে উচ্চ পাহাড়ের উপরে নৃসিংহস্বামীর মন্দির; উক্ত রাস্তার পার্শ্বে এক পর্ব্বতের নিকট একটী বৃহৎ বাঁধান পুষ্করিণী আছে, তাহা ব্রহ্মতীর্থ নামে খ্যাত। লোকপ্রবাদ এই যে, ব্রহ্মা পুরাকালে এই তীর্থের ধারে নৃসিংহদেবের তপস্যা করিয়াছিলেন, উক্ত পুষ্করিণীর পাড়ে এক পুরাতন মন্দিরে শ্রীবরদারাজস্বামীর মূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে। লোকে বলিয়া থাকে যে, দণ্ড্যাচার্য্য ঐ স্থানে ভগবানের তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখা দিয়াছিলেন। তৎপরে দণ্ড্যাচার্য্য ঐ স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীবরদারাজ স্বামীর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মতীর্থ সহরের মধ্যস্থলে। ১৭৮১ খৃঃ সার্ আয়ারকুট সাহেবের সহিত হাইদার-আলির এক তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল, ইহাতে হাইদার-আলি পরাজিত হয়। যে সকল মুসলমান সৈন্য ঐ যুদ্ধে মারা পড়িয়াছিল, তাহাদের মৃতদেহ দুইটি গর্ত্তে প্রোথিত হয় তদুপরি চিহ্ন-স্বরূপ দুই মেওসোলিয়ম নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া হাইদার-আলির পরাজয়ের পরিচয় দিতেছে।

বেলা ১১টার সময়ে মন্দিরের দর্শনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া বেলা ৩টার সময়ে তিরুত্তানির দিকে অগ্রসর হই।

তিরুতানি।

তিরুতানি শোলিঙ্গম্ হইতে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত; ইহা কার্বেথ নগরের জমিদারীর অন্তর্গত। অপরাহ্ণ ৬টার সময় এখানে পৌছিয়া শুনিলাম যে, ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত এই মন্দিরের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমি দেব-দর্শনাভিলাষে তৎপর হইয়া মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। দেবের উৎপত্তি বিষয়ে স্থানীয় প্রবাদ এই যে, পুরাকালে সুব্রহ্মণ্য-স্বামী, তারকাসুর, সিংহবক্রাসুর, সুর পদ্মাসুর প্রভৃতি অসুরদিগকে বধ করিয়া এই স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করেন; অতএব "তিরুতানিগৌ" অর্থ সুবিশ্রাম, তাহা হইতে নাম উৎপন্ন হইয়াছে ও তাহারই অপভ্রংশ তিরুতানি।

ইন্দ্র, স্বর্গে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে সুব্রহ্মণ্যস্বামীকে পরি-তুষ্ট করিবার মানসে আপন কন্যা দেবসেনাকে অর্পণ করেন। সুব্রহ্মণ্যস্বামী তাঁহার পাণিপীড়ন করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন; তদনন্তর বল্লীম্মা নাম্নী অপর কোন রমণীরও পাণি-গ্রহণ করেন, এই বিষয়ে দুইটি প্রবাদ আছে। ১ম;—বল্লীম্মা কোন ব্রাহ্মণের ঔরসে চণ্ডালকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার মাতা আপন স্বামীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, সদ্যজাত শিশুকে বনে ফেলিয়া পতির অনুসরণ করিবেন। সুতরাং বল্লীর জন্ম হইবামাত্র তাঁহার মাতা তাঁহাকে বনে

ত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুগামিনী হইয়াছিলেন। কোন অস্পৃশ্য জাতি উক্ত কন্যাকে বনে প্রাপ্ত হইয়া লালন পালন করিয়াছিল; বল্লী ক্রমে শশিকলা সদৃশ বাড়িয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে তিনি রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না বলিয়া সর্ব্ব সমীপে আদরণীয়া হইতে লাগিলেন। বল্লীম্মা পাহাড়ে বসিয়া পিতার শস্যক্ষেত্র রক্ষা করিতেন। এক দিবস সুব্রহ্মণ্যস্বামী মৃগয়া উপলক্ষে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পান এবং তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া বিবাহ করিবার উদ্দেশে তিরু-তানি হইতে এক সুড়ঙ্গ খনন করিয়া তদ্দ্বারা প্রত্যহ যাতায়াত করিতে করিতে ক্রমে বল্লীম্মার মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন, পরে বল্লীম্মাকে বিবাহ করিয়া, সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন এবং কিছুকাল পরে তাঁহাকে তিরুত্তানিতে লইয়া যাইয়া আপন আলয়ের এক স্থানে রাখিয়া দেন।

উত্তর-অরুকড়ুর অন্তর্গত চিতুর তালুকের মেলপদি গ্রামে বল্লীর পালিত পিতার বাস ছিল; এই গ্রামের ১ মাইল পশ্চিমে যে স্থানে তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ, পরে মিলন ও বিবাহ হয়, অদ্যাপি তথায় একটি মন্দিরে সুব্রহ্মণ্যস্বামী ও বল্লীম্মার মূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে। ফল কথা, বল্লীর মাতা কোন অস্পৃশ্য জাতির কন্যা ছিল; কেহ কেহ কহেন যে, বল্লীর মাতা সুপ্রসিদ্ধ তামিলকবি তিরুবল্লুবের ভগিনী ভিন্ন অপর কেহ নহে।

২য়— প্রবাদ এই যে, কোন সময়ে লক্ষ্মী ও নারায়ণ হরিণ ও হরিণীরূপে কৌতুকক্রীড়া করিয়াছিলেন। হরিণরূপিণী লক্ষ্মী,

তাহার ফলস্বরূপ এক কন্যা প্রসবপূর্ব্বক বনে ত্যাগ করিয়া যান; সপতীকা নগরীর কুরব নামে কোন রাজা বল্লীমলয় নামক পর্ব্বতে ঐ কন্যাকে কুড়াইয়া পাইয়া লালন পালন করেন এবং তাঁহাকে বল্লীমলয়ের নিকট পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বল্লীম্মা রাখেন। কোন সময়ে সুব্রহ্মণ্যস্বামী মৃগয়ার্থ বিচরণ করিতে করিতে রূপ-যৌবন-সম্পন্না উক্ত কন্যা দেখিতে পাইয়া রাজার নিকট কন্যার করপ্রার্থী হইলে রাজা তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন। সুব্রহ্মণ্য স্বামী নব বিবাহিতা পত্নীকে আপন আলয়ে আনয়নপূর্ব্বক পৃথক্ স্থানে রাখিয়া দেন।

তিরুতানির মন্দির পুরাতন বলিয়া প্রতীয়মান হইল। একাদশ শতাব্দীতে চোলরাজাদিগের সময় ইহার মূল পত্তন হইয়া থাকিবে ও বিজয়নগরের রাজগণ কর্ত্তৃক উহার সংস্কার বর্দ্ধিত করিয়া থাকিবে। ইহা একটী উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত, তথা হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি মনোহর, পাহাড়ে উঠিবার নিমিত্ত দুইটি পথ আছে ও উভয় পথেই উত্তম সোপান আছে; যাত্রীদিগের থাকিবার জন্য রাস্তার ধারে অনেকগুলি ছত্র আছে। মন্দিরের পার্শ্বে কুমার, ব্রহ্ম, অগস্ত্য, ইন্দ্র, শেষ, রাম, বিষ্ণু, নারদ ও সপ্তর্ষি নামে ছোট বড় নয়টি তীর্থ আছে। প্রত্যেক তীর্থের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে।

মন্দিরের সম্মুখে যে পুষ্করিণী আছে, তাহাকে পুণ্যতম কৈলাসতীর্থ কহে। সুব্রহ্মণ্যস্বামীর দণ্ডায়মান প্রস্তরময় মূর্ত্তি,

প্রমাণ মনুষ্যাকৃতি ও চতুর্ভুজ; তিনি শৈশবে কৃত্তিকা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রত্যেক কৃত্তিকানক্ষত্রে এই মন্দিরে তাঁহার উৎসব হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী কৃত্তিকায় মহাসমারোহে উৎসব হইয়া থাকে ও সেই সময় দূরদেশ হইতে বহুলোকের সমাগম হয়।

দেবসেনা ও বল্লীমাতার মন্দির পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে এবং পূজাদিও পৃথক্‌রূপে হইয়া থাকে।

তিরুতানি চারি অংশে বিভক্ত। ১ম, খাস তিরুতানি; ইহা পর্ব্বতের উপরে ও দেবালয়ের পার্শ্বে; এখানে অধিকাংশ বৈদিক অর্চ্চক বাস করেন। ২য়, মটট্‌গ্রাম; এখানে ৩০টি মঠ, ১০টি ছত্র ও ২৩টি মণ্ডপ আছে বলিয়া ইহাকে মটট্‌গ্রাম কহে। ৩য়, নল্লীন্‌গুণ্টা; নল্লীন নামে কোন রাজা ৯০ বৎসর পূর্ব্বে এক বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ-দিগের বাসের নিমিত্ত পাকা বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তদবধি রাজার নামে উক্ত গ্রাম অভিহিত হইতেছে। ৪র্থ, অমৃতপুর; এই স্থান সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। এখানকার বর্ত্তমান জমিদারের পিতামহ বেঙ্কট পেরুমল্‌রাজু কোন সময়ে অতিশয় রোগাক্রান্ত হইয়া এই স্থানে উপস্থিত হন, তদনন্তর দুগ্ধ ও ঘোল পানে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া উক্ত গ্রাম অমৃতপুর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

দেবালয়ের দক্ষিণদিকে ১ মাইল দূরে এড়ুবন নামে একটি কাননে সাতটি কুণ্ড আছে, উক্ত কুণ্ডের নিকট সপ্তকুমারী-

দিগের মন্দির, কিন্তু এখন তাহা ভগ্নাবস্থায় আছে। কার্বেথ-নগরের জমীদার এখনকার মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

কালহস্তী।

৪ঠা অক্টোবর সোমবার প্রাতে আহারাদি সমাপনান্তে রেলযোগে কালহস্তী যাত্রা করি; অপরাহ্নে ৩টার সময় তথায় পৌঁছিয়া ছিলাম।

কালহস্তী তন্নামক জমিদারীর প্রধান নগর এবং সুবর্ণমুখী নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। তিরুপতি-নেল্লুর ষ্টেট-রেলওয়ের ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে অবস্থিত।

এখানকার জমিদারদিগের আদিপুরুষের নাম দামার-জবি-রয়া-নিবারু; জমীদারের পুস্তকাগারে যে সকল সনন্দ আছে, তন্মধ্যে আরঙ্গজেব বাদশাহ যে সনন্দ দেন, তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ত্তমান জমিদারের পূর্ব্বপুরুষ পলিগার নামে অভিহিত হইতেন ও ৫ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন, আরকটের নবাবের অধীনে আবশ্যকমতে উক্ত ৫ হাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধে যাইতেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে কালহস্তীর পলিগারগণ আপন ক্ষমতা অনেক দূর বিস্তার করিয়াছিল; এমন কি পূর্ব্বদিকে

মন্ত্র ও কাঞ্চীপুর দক্ষিণদিকে বন্দীবাস পর্য্যন্ত আপন বশে আনিয়াছিলেম এবং অনেক সময় তাঁহারা স্বাধীনভাবে চলিতেন। কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় তাঁহারা হাইদার-আলি ও টিপু-সুলতানের বশবর্ত্তী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৭৯৯ খৃঃ টিপুসুলতানের মৃত্যু হইলে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কালহস্তীর পলিগরকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করেন ও ১৮০১ খৃঃ বশে আনিয়া সমস্ত সৈন্যসামন্ত ছাড়াইয়া দিতে বাধ্য করেন ও চিরস্থায়ী সনন্দ দিয়া জমীদার নামে অভিহিত করেন; সেই অবধি কালহস্তীর পলিগারগণ জমীদাররূপে পরিণত হইয়াছে। এই জমীদারীর আয় ৬ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমান জমীদার সি, আই, ই, ও রাজা উপাধিতে সম্মানিত হইয়াছেন। এই সহরে ৬।৭ হাজার লোকে বাস করে।

এখানকার শিবমন্দিরই প্রধান তীর্থ, স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণগণ ইহাকে দ্বিতীয় বারাণসী সদৃশ পুণ্যভূমি মনে করেন। মন্দিরটি অতি পুরাতন, সম্মুখের গোপুর উত্তম ও বৃহৎ; ইহা কৈলাস নামক পর্ব্বতের পদতলে ও সহরের পশ্চিম-দক্ষিণকোণে অবস্থিত। কথিত আছে যে, ব্রহ্মা এই স্থানে তপস্যা করিতে আসিবার সময়ে কৈলাসের শৃঙ্গের একাংশ আনিয়া এই স্থানে স্থাপন করেন, তদবধি এই পর্ব্বত দক্ষিণ কৈলাস নামে অভিহিত। প্রবাদানুসারে ব্রহ্মা স্বয়ং এই মন্দিরের মূল স্থাপন করেন, কিন্তু অপরাপর অংশ চোলরাজা ও বিজয়নগরের কৃষ্ণরায়ালু নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির অন্যতম অনাদি বায়ুমূর্ত্তি এখানে বিরাজমান। কালহস্তী নামের উৎপত্তি বিষয়ে যে বিবরণ কথিত আছে তাহা এই ;—

এক নাগ ও এক হস্তী উভয়ে মহাদেবের আরাধনা করিতে থাকে ; নাগ আপন মণি মহাদেবের মস্তকে রাখিয়া আরাধনা করিত, হস্তী জলাভিষেকের দ্বারা আরাধনা করিত। কোন এক দিবস হস্তী জলাভিষেক করিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ নাগের গাত্রে জল লাগিয়াছিল, নাগরাজ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তীর শুণ্ডে দংশন করিলে হস্তী দংশন জ্বালায় উন্মত্ত হইয়া দৌড়িয়া এমন জোরে নাগাঙ্গে আঘাত করিল যে, সেই আঘাতে নাগ ও হস্তী উভয়েই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

মহাদেব পূর্ব্ব হইতে তাহাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, এই ঘটনা দেখিয়া মহাদেব তাহাদের পুনরায় জীবন দান করিয়া আপন আলয় তাহাদের নামে অভিহিত করিলেন। তখন হইতে এই দেবালয়ের নাম কালহস্তী হইয়াছে। কাল অর্থে সর্প, হস্তীর অপভ্রংশ হস্ত্রী, কালহস্ত্রী বা কালহস্তী।

কন্নাপন নামে কোন ব্যাধ কৈলাস পর্ব্বতের উপরে বাস করিত ; উক্ত ব্যাধ প্রত্যহ আহার করিবার পূর্ব্বে উপর হইতে নামিয়া আসিয়া আহার্য্য দ্রব্য মহাদেবকে অর্পণ করিয়া পরে প্রসাদ পাইত। কিছু কাল এইরূপ করিতে করিতে তাহার মনে ধারণা হইল যে, মহাদেবের একটি চক্ষু নষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পান না ; পরে ব্যাধ আপন একটি

চক্ষু উৎপাটন করিয়া মহাদেবের নষ্ট চক্ষুতে বসাইয়া দিল। আবার কিছু দিন পরে তাহার প্রতীয়মান হইল যে, ভগবানের অপর চক্ষুটিও নষ্ট হইয়াছে, তখন পুনরায় আপন অবশিষ্ট চক্ষু দিয়া মহাদেবের চক্ষু ভাল করিয়া দেয়। আপন অবশিষ্ট চক্ষু উৎপাটন করিলে অন্ধ হইব, এই আশঙ্কায় মহাদেবের চক্ষুর স্থানে আপন পা রাখিয়া দুই হস্তে চক্ষু উৎপাটন করিয়া মহাদেবের চক্ষুতে বসাইয়া দিল। অদ্যাপিও মহাদেবের চক্ষে ভক্ত পদচিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভগবান্ ব্যাধের উপর পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সালোক্যমুক্তি দান করেন। ব্যাধ হইলেও সেই অবধি লিঙ্গরূপী হইয়া মহাদেবের সন্নিকটে থাকিয়া পূজা পাইতেছেন। তাঁহার অপর এক মূর্ত্তি কৈলাসপর্ব্বতের শিখরদেশে আপন বাসস্থানে এবং তৃতীয় মূর্ত্তি পাহাড়ে উঠিতে 'পথের মধ্যস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উক্ত দুই স্থানেও পূজা পাইতেছেন।

এখানকার পার্ব্বতীদেবীর নাম জ্ঞান-প্রসন্না। উক্ত নামে অভিহিত হইবার কারণ একটি প্রবাদ আছে। ভগবান্ কোন সময়ে দেবীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন যে, নরলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। তদনন্তর দেবী নরযোনি প্রাপ্ত হইয়া প্রভূত জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিলে মহাদেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মুক্তি দিয়া জ্ঞান-প্রশন্না নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

দুর্গাদেবীর তপস্যার সময়ে দুর্গাম্মা নামে কোন মহিলা তাঁহার সহগামিনী হইয়াছিল। মহাদেব তাঁহারও উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেও দেবত্ব দেন। তদবধি দুর্গাম্মা দেবী-মন্দিরের উত্তরদিকে পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া অদ্যাপিও পূজা পাইতেছেন।

শিবালয়ের দক্ষিণদিকে পাহাড়ের পার্শ্বে আর একটি শিবালয় আছে; ভগবানের নাম মণিকুণ্ডেশ্বর স্বামী। কোন মহিলা ব্রহ্মজ্ঞান পাইবার প্রত্যাশায় এই স্থানে মহাদেবের তপস্যা করিয়াছিলেন; মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণে তারকব্রহ্ম মন্ত্র প্রদান করেন ও তাহাতে তাঁহার মুক্তি হয়, সেই আশয়ে এখনও মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগকে এই স্থানে আনা হইয়া থাকে; তাহাদিগকে দক্ষিণপার্শ্বে কর্ণ রাখিয়া শয়ন করাইয়া দেওয়া হয়। বিশ্বাস যে মৃত্যুর সময় সেই মুমূর্ষু ব্যক্তি দক্ষিণ-পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া বামপার্শ্ব হইলে দক্ষিণকর্ণ দিয়া অন্ত-রাত্মা বাহির হইবে ও সেই ব্যক্তির আত্মা চিরানন্দ ভোগ করিবে।

এই মন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বে চতুর্মুখ ব্রহ্মার মন্দির ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই মন্দিরের মূল স্থান দ্বিতল, ইহা পাহাড়ের পাদদেশে নির্ম্মিত হইয়াছে ও তাহার গায়ে নানা প্রকার মূর্ত্তি খোদিত আছে; পুরাকালে ব্রহ্মা কৈলাস পর্ব্বতের একাংশ এই স্থানে আনিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। আরও প্রবাদ আছে যে, ব্রহ্মা যে স্থানে বসিয়া তপস্যা করিয়া-

ছিলেন, উক্ত মন্দির সেই স্থানে স্থাপন করা হইয়াছে। দক্ষিণ-দেশে আর কোথাও ব্রহ্মার মন্দির দেখি নাই।

চতুরানন ব্রহ্মার মন্দিরের দক্ষিণদিকে ও পাহাড়ের উপত্যকায় চতুর্দ্দিক প্রস্তর নির্ম্মিত পাকা ঘাট বাঁধান একটি প্রশস্ত পুষ্করিণী আছে; পূর্ব্বে এই পুষ্করিণীতে স্বামীর জলক্রীড়া উৎসব হইত, প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল তাহা বন্ধ হইয়াছে। পুষ্করিণীর সন্নিকটে পাহাড়ের উপর ভরদ্বাজ স্বামী নামে ঈশ্বর মূর্ত্তি আছে, এই উপত্যকা ভরদ্বাজমুনির আশ্রম বলিয়া খ্যাত।

এখান হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে বিয়ালিঙ্গকোনা নামে এক পাহাড় আছে, তথায় সহস্র লিঙ্গ বিদ্যমান থাকায় পাহাড় উক্ত নামে কথিত হয়।

দেবদর্শনে যাইয়া দেখিলাম, বায়ুরূপী ঈশ্বর সচরাচর লিঙ্গের সদৃশ নহে; লিঙ্গ মাত্রেই দণ্ডগোলাকৃতি হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা চতুষ্কোণাকৃতি। আমি সন্ধ্যার পর ঈশ্বর দর্শনে যাই, তৎকালে জলাভিষেক হইতেছিল; কাজেই লিঙ্গ অনাবৃত, সুতরাং লিঙ্গাবেশ স্পষ্টরূপে দেখিলাম।

দ্বারের সম্মুখে যে দণ্ড তাহাতে গজ, নাগ ও উর্ণনাভির মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে; মূল স্থানের কোন দিক্ দিয়া বাতাস প্রবেশের পথ নাই, কিন্তু লিঙ্গের মাথার উপর যে দীপালোক ঝুলান আছে, তাহা সর্ব্বদাই ঈষৎ দুলিতেছে। অন্য শত শত দীপ গর্ভগৃহে থাকিলেও আন্দোলিত হইতেছে না। শুনিলাম লিঙ্গের পশ্চাৎ ভাগে অপর একটি দীপ জ্বলিতে থাকে, কেহ কেহ

কহেন উক্ত দীপের উত্তাপে উপরস্থিত বায়ু আন্দোলিত হয় ও তাহার সাহায্যে লিঙ্গের মস্তকোপরি প্রদীপ আপনা আপনি ঈষৎ দুলিতে থাকে, যাহা হউক এই কারণপ্রযুক্ত উক্ত লিঙ্গ বায়ুলিঙ্গ নামে অভিহিত হইতেছে। অভিষেকান্তে ভগবানের অর্চ্চনাদি করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

মাঘ মাসে এখানে ১০ দিন পর্য্যন্ত উৎসব হইয়া থাকে; তদুপলক্ষে প্রায় ২০ বিশ হাজার লোক সমবেত হয়। উৎসবের পঞ্চম দিবসে সকলে উপবাস করিয়া রাত্রিকালে বেদপাঠ ও ধর্ম্মালোচনায় সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। অধিকন্তু যে সকল স্ত্রীলোক অপুত্রক ও ব্রহ্মদৈত্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাঁহারা স্নান করিয়া জ্ঞান-প্রসন্নাদেবীর সম্মুখে ভিজা কাপড়ে অধোমুখ হইয়া পড়িয়া থাকেন। ঐ রূপ ক্রিয়ার নাম প্রাণাচার-ব্রত, যিনি যত সময় ধরিয়া একাগ্রচিত্তে দেবীকে ধ্যান করিতে সমর্থ হন, তাঁহার ততই মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।

উৎসবের অষ্টম দিবসে মহাদেবের ভোগমূর্ত্তি রথে করিয়া নগর পরিভ্রমণ করান হয়, সেই সময়ে জমীদারের হস্তী, ঘোড়া, বর্ষাধারী অনুচরগণ সকলেই এই উৎসবে যোগ দিয়া থাকেন।

এই দেবালয়ের আভরণাদির মূল্য কম নহে, এক বৎসর দুই মাস পূর্ব্বে যে আভরণ মণিমুক্তাদি অপহৃত হইয়াছে, তাহার মূল্য লক্ষ টাকার অধিক হইবে।

নারায়ণবন।

৫ই অক্টোবর মঙ্গলবার প্রাতে নারায়ণবন নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছি; নারায়ণবন মান্দ্রাজ রেলওয়ের পত্তুর ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে অরুণনদীর তীরে অবস্থিত।

১৮৮১ সালের লোকসংখ্যার তালিকায় জানা যায় এখানে ৩৯১৩ জন লোকের বাস। ইহা একটি পুরাতন প্রসিদ্ধ তীর্থ-স্থান এবং কার্‌বেথ নগরের জমিদারী ভুক্ত। চতুরানন ব্রহ্মা এক সময়ে সুপ্রসিদ্ধ কাঞ্চিপুরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যজ্ঞের সীমাস্বরূপ এই স্থান নির্ণীত হইয়াছিল। এই স্থানে অমনারা চৈরম্মা বা মহিষাসুর-মর্দ্দিনী আসিয়া যজ্ঞস্থলের সীমা রক্ষা করিয়াছিলেন। মহিষাসুর-মর্দ্দিনী সেই অবধি এই স্থানে অব-স্থান করিতেছেন।

নারায়ণবন শব্দে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে এখানে বন ছিল ও সেই বনে ভগবান্ নারায়ণ বিচরণ করিতেন। অতএব ইহা অতি পবিত্র স্থান বোধে ব্রহ্মার যজ্ঞশালার সীমা-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে।

স্থানীয় হস্তলিপিতে জানা যায় যে, তঞ্জাবুরের মহারাজ কুলোত্তুঙ্গ চোলের জারজপুত্র তণ্ডীমান মহারাজ চক্রবর্ত্তী এই স্থান আপন অধিকার ভুক্ত করেন; এবং তাঁহার বংশধর-গণ ক্রমান্বয়ে চারি পুরুষ রাজত্ব করেন। তাঁহার প্রপৌত্র

রাজা নারায়ণদেবের রাজত্বকালে পবাসম্বন নামক জনৈক মিথিলার রাজা তিরুপতির তীর্থদর্শনে আইসেন; তিনি দেশের অবস্থা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কিছু কাল তিরুপতির ব্যঙ্কটেশ্বরের আরাধনা করিয়াছিলেন, তদনন্তর ব্যঙ্কটেশস্বামী মিথিলাপতির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সদয় হইলে, রাজা প্রার্থনা করেন যে, তিরুপতির সন্নিকটে তাঁহাকে রাজত্ব করিতে অনুজ্ঞা দেওয়া হয়। তখন ব্যঙ্কটেশস্বামী তাঁহাকে নারায়ণদেব রাজার নিকট যাইয়া মনোরথ ব্যক্ত করিতে আদেশ করেন, পবাসম্বন রাজা সত্বর হইয়া নারায়ণ মহারাজের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে মহারাজ তাঁহাকে আপন রাজত্বের অর্দ্ধেক অর্পণ করেন। পবাসম্বন রাজ্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া নারায়ণবনে আপন রাজধানী স্থাপন করেন।

পবাসম্বন রাজার চারি পুত্র ছিল; ১ম আকাশরাজ, ২য় উজ্জ্বলরাজ, ৩য় ব্যঙ্কটেশরাজ ও ৪র্থ বর্দ্ধণরাজ। পিতার মৃত্যু হইলে প্রথম পুত্র রাজ্যাভিষিক্ত হন, ইনি আপন নামে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন ও তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত দুইটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান সহর হইতে আকাশরাজপুর ৩ মাইল দূরে ছিল; তিনি যে দুইটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাহা আকাশ-রাজকোট্টাই নামে অভিহিত। ইহার সীমার মধ্যে অগস্ত্যেশ্বর মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে; কোম্পালিয়ম্ নগরে অপরটির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

আকাশরাজের পুত্রকন্যা না হওয়ায়, শাস্ত্রানুসারে তিনি পুত্রেষ্টিযাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। যজ্ঞস্থলের সীমা নির্দ্ধারিত করিবার নিমিত্ত স্বর্ণলাঙ্গলে জমী খনন করিতে করিতে জমীর মধ্যে এক স্বর্ণপদ্ম দেখিতে পান ও তাহা কুড়াইয়া লইয়া দেখিলেন যে, তাহার পাবড়ীতে একটী স্বর্ণবর্ণের কন্যা রহিয়াছে। তাঁহার অমাত্যগণ তদ্দৃষ্টে কহিল যে, এই কন্যা লক্ষ্মীর অবতার ভিন্ন আর কিছুই নহে। তখন তিনি সেই কন্যাটীকে ঘরে লইয়া যান এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে থাকেন। পদ্ম হইতে পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম পদ্মাবতী রাখিয়াছিলেন। যজ্ঞসম্পন্ন হইলে যথাসময়ে রাজার একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। পদ্মাবতী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে নারায়ণবনে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন। লোকে কহিয়া থাকে যে, নারায়ণবনের পশ্চিম দিকে যে বৃহৎ বন আছে, তাহার সন্নিকটে রাজা উক্ত কন্যাকে পাইয়াছিলেন।

একদা ব্যঙ্কটেশস্বামী মৃগয়া উপলক্ষে নারায়ণবনে বিচরণ করিতে করিতে পদ্মাবতীকে দেখিতে পাইলেন; তখন তিনি তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া কর প্রার্থনা করেন, কন্যা তাহাকে প্রত্যুত্তরে বলেন যে, পিতার আদেশ ব্যতীত বিবাহ হইতে পারে না। অনন্তর তিনি আকাশরাজের নিকট পদ্মাবতীর কর প্রার্থনা করেন, রাজাও শাস্ত্রানুসারে আপন কন্যাকে সম্প্রদানে স্বীকৃত হইলে, ব্যঙ্কটেশস্বামী নারায়ণবনে যাইয়া পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করেন; অনন্তর তিনি আকাশরাজের

প্রার্থনানুসারে পদ্মাবতীর সহিত নারায়ণবনে অবস্থিতি করিয়া সুখসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজাও তাঁহাদের বাসের নিমিত্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। দেব অদ্যাপি তথায় কল্যাণব্যঙ্কটেশ নামে পূজিত হইতেছেন।

আকাশরাজের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বসম্বর্ণ রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইলে পিতৃব্য ব্যঙ্কটেশরাজ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেষ রাজার নাম রিবন্ধ; তিনি রামরাজ নামক কোন রাজকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন।

রামরাজের বংশধরেরা এই স্থানে একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে বিজয়নগরের নৃপতি কর্ত্তৃক পরাজিত হন। অতঃপর কারবেথ নগরের পলিগারেরা(১) এই স্থান অধিকার করে ও সেই অবধি তাহাদিগের দখলেই আছে। পলিগারদিগকে এখন জমীদার নামে অভিহিত করা হইয়াছে, এই জমীদারীর আয়তন ৯৪৩ বর্গ মাইল। ইহাতে ২,৯৪০০০ দুই লক্ষ চোরানব্বই হাজার লোকের বাস।

জমীদারেরা কারবেথনগরে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের কোন আত্মীয় নারায়ণবনে বাস করিতেন; এই আবাসবাটী পুরাতন ও মেরামতাদিও নাই। কল্যাণব্যঙ্কটেশ্বরের মন্দিরটি অতি বৃহৎ, ইহাতে দুইটি প্রাচীর ও দুইটি

(১) পলিগার ৫ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক।

প্রাচীরে দুইটি গোপুর আছে। ভিতর অঙ্গনের পূর্ব্ব-দক্ষিণ-কোণে বাহনমণ্ডপ ও পূর্ব্ব-উত্তর কোণে আর একটি কৈকাল নামে মণ্ডপ আছে. প্রাঙ্গণের দক্ষিণোত্তর কোণে পদ্মাবতী দেবীর কোবি-হল্[১] বিদ্যমান আছে, ইহা একটি স্বতন্ত্র মন্দির। প্রাঙ্গণের পশ্চিমোত্তর কোণে থায়ুমার কোবি-হল্।

ব্যাঙ্কটেশ্বরস্বামী থায়ুমার পাণিগ্রহণ বিষয়ে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে। তেনিবল্লী জেলার অন্তর্গত শ্রীবিল্লীপুত্র নামক স্থানে পেরিওয়াল বিষ্ণু শেটীয়ার নামে কোন বণিক বাস করিত। তাঁহার থায়ু নামে একটী কন্যা ছিল। থায়ু ক্রমে তপস্যায় রত হইয়া বহু দিবস পর্য্যন্ত রঙ্গনাথ স্বামীর তপস্যা করেন, রঙ্গনাথ তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ হইলে থায়ুমা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহাদের বিবাহের পর তাঁহারা নারায়ণবনে বাস করিতে থাকেন। তদবধি ঐ কন্যা থায়ুমা নামে উক্ত হইতেছেন ও পূজাও পাইতেছেন।

পদ্মাবতী কোবি-হল্ ও থায়ুমার মন্দিরের মধ্যস্থলে কল্যাণ-মণ্ডপ, এই মণ্ডপ উক্ত দুই মন্দির অপেক্ষা পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয়, মন্দিরের মূলস্থান আকাশরাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। পরে বিজয়নগরের রাজারা ভিতরের প্রাচীর ও কারবেথ নগরের জমীদারেরা বাহিরের প্রাচীর এবং গোপুর নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

---

(১) কোবি হল্—মন্দির।

বিগ্রহের মূর্ত্তি তিরুপতির বিগ্রহের সদৃশ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড়। শ্রীরামানুজমতাবলম্বী শ্রীবৈষ্ণবেরা এই বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকেন। কারবেথ নগরের জমীদারেরা পূজার ব্যয়-নির্ব্বাহ করিতেছেন, দেবসেবার্থ কয়েকখানি গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছে। আয় ব্যয় হিসাব মন্দিরের লোকেরাই রাখেন।

বেদপাঠের চর্চ্চা বিলক্ষণ আছে।

পূর্ব্বোক্ত অগস্ত্যেশ্বর মন্দির এখান হইতে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত, এই মন্দির দেখিতে অতি পুরাতন, নীল (মরকত) পাথর দ্বারা নির্ম্মিত, পাথরে অতি পরিষ্কার খোদিত কারুকার্য্য আছে

দেবীর মন্দির পৃথক্ ও সাধারণ গ্রেনাইট প্রস্তরে প্রস্তুত।

অগস্ত্যেশ্বর-মন্দিরের খোদিত অনুশাসনপাঠে জানা যায় যে, কুলোত্তুঙ্গ চোলরাজার একাদশ বৎসর রাজত্বকালে ৮২৬ শকাব্দে বেলুরপঙ্ক মনিবাশ নাগদেব নামক জনৈক অগস্ত্যেশ্বর-দেবের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ চালুক্যপুর নামে একখানি গ্রাম প্রদান করেন। অপর একটি অনুশাসনে জানা যায় ১০৭৮ শকে ত্রিভুবনমল্লদেব নামে জনৈক রাজা দেবসেবার ব্যয়ার্থ কতক-গুলি জমী প্রদান করেন।

উপরোক্ত দুই অনুশাসনে বেশ প্রমাণ হইতেছে যে, মন্দির অতি পুরাকাল হইতে বিদ্যমান আছে।

এখানকার পূজাপদ্ধতি অন্যান্য শিবালয়ের সদৃশ।

গুরুকুল বা অর্চ্চক যিনি আমাদের অর্চ্চনার কারণ পৌর-হিত্য করিয়াছিলেন, সংস্কৃত অনভিজ্ঞ হইলেও মন্ত্রাদি পরিষ্কার

রূপে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই মন্দির হইতে প্রায় ১২ শত ফুট অন্তর পূর্ব্বোক্ত মহিষাসুরমর্দ্দিনীর মন্দির কেমপুলা-পালিয়ম্ নামক স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে।

দেবীর মূর্ত্তি অষ্টভুজা এক পদ সিংহের উপর অপর পদ সোমকাসুরের উপর। মূর্ত্তি প্রায় ৮ ফুট উচ্চ হইবে।

পূজারিরা ব্রাহ্মণ নহে, তক-শ্রেত্রীয় নীচ জাতি শূদ্র।

প্রতি শুক্রবারে অভিষেকাদি উৎসব হইয়া থাকে।

শ্রাবণমাসে ১৫ দিন ধরিয়া উৎসব হয়। উৎসবের সময় একটি মহিষকে সজ্জিত করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরাণ হয়, পরে দ্বাদশ দিবসে মন্দিরের সম্মুখে উক্ত মহিষকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বিশ্বাস যে, শক্তিদেবীর প্রভাবে উক্ত মহিষ কোনও না কোন সময়ে বলির স্থানে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রস্তরের উপর মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে, পূজারি বলির খাঁড়া মন্ত্রপূত করিয়া হত্যাকারীর হস্তে প্রদান করে, হত্যাকারী তাহাকে এক কোপে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে। অনন্তর উক্ত মহিষের রক্ত আহার্য্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দেয়। উক্ত মহিষের দেহ নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুতিবার প্রথা আছে। উক্ত দিবস প্রাতে পূর্ব্ব বৎসরের পোতা মহিষকে উঠাইয়া জমীদারের বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, কারণ জমী-দার পূর্ব্বপ্রথানুসারে তাহা দেখিয়া আগামী বৎসরের শুভা-শুভ বুঝিতে পারেন। মাংস অবশ্য পচে, কিন্তু পেটের মল কোন বৎসর পচে, কোন বৎসর পচে না, জমীদার পেটের মল

সন্দর্শন করেন। যদি মল না পচিয়া থাকে, তবেই জমীদারের মঙ্গল, অর্থাৎ সুবৃষ্টি ও সুফসল হইবে। আর যদি পচিয়া থাকে, তবে অনাবৃষ্টি, অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির সম্ভাবনা এবং যদি মলেতে সাদা সাদা ছেদো পড়িয়া থাকে, তবে দেশে মৃত্যুভয় উপস্থিত হইবে।

এতদঞ্চলে প্রায়ই দেখা যায় যে, ১ বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে পর বৎসর অতিবৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং যে স্থানে মহিষকে পোতা হয়, অনাবৃষ্টি হইলে সেই স্থান শুষ্ক থাকে ও মহিষের দেহস্থ মল শুষ্ক থাকে, পচে না। অতিবৃষ্টি হইলে সেই স্থান আর্দ্র হয়, সুতরাং মলও পচিয়া যায়; অবিকৃত অবস্থাতে থাকিলে পর বৎসর সুবৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক, জমীদার উহা পরিদর্শন করিয়া আপন জমীদারীর শুভাশুভ বুঝিতে পারেন, এই কারণে শক্তিদেবীর প্রতি তাহাদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা আছে।

এই অমনায়াচৈম্বাদেবীকে ব্রাহ্মণেরাও সমভাবে পূজা করিয়া থাকেন। এখানকার শূদ্রঅর্চ্চকগণ অর্চ্চনাকালীন ব্রাহ্মণদিগেরও পৌরহিত্য করিয়া থাকেন; তাহারা তামিল-কম্বি কম্বালের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

এখানকার এই শূদ্র পূজারীগণ পূজার সময় কেবল যজ্ঞোপবীত ব্যবহার করেন মাত্র, সংস্কৃত না জানিলেও তাঁহারা বেশ পরিষ্কার মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকেন। মদ্য মাংস যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে মৃতদেহ দাহ করা প্রথা নাই, সমাধি দিবার নিয়ম আছে।

মন্দিরের মূলস্থান সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, সম্মুখের মণ্ডপ পরে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। দ্বারের উপরের গোপুর অসম্পূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান আছে। মন্দিরের চতুঃপার্শ্বস্থ প্রাচীর কার্‌বেথ নগরের জমীদারদিগের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল।

উপসংহার।

আমরা উত্তর অরুকদু জেলায় যে কয়েক দেবালয় দর্শন করিয়াছিলাম, তাহার প্রত্যেক দেবালয়েই ভগবানের পূজা, অর্চ্চনাদি দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিলাম। পূজার কারণ নৈবেদ্যের গোলযোগ নাই। প্রত্যেক দেবের নিকট নারিকেল-কদলী-সুপারিভোগ দেওয়া হইয়া থাকে ও কর্পূরালোকে আরতি হইয়া থাকে, পূজার প্রধান অঙ্গ অভিষেককার্য্য শৈব-মন্দিরে যজুর্ব্বেদীয় নমকং চমকং মন্ত্রপাঠে জলাভিষেক হইয়া থাকে ও বিষ্ণুমন্দিরে চিত্তি উপনিষদের পুরুষসূক্ত মন্ত্রপাঠে পুষ্পাভিষেক হইয়া থাকে। দেবীমন্দিরে ঋগ্বেদীয় শ্রীসূক্ত ও ভূসূক্তপাঠে পুষ্পাভিষেক হইয়া থাকে। ঈশ্বর অর্চ্চনায় বিল্বদল, বিষ্ণু অর্চ্চনায় তুলসী ও পারিজাত এবং দেবী-অর্চ্চনায় কুঙ্কুম প্রশস্ত; অর্চ্চনান্তে ধূপ, দীপ ও পূর্ব্বোক্ত নৈবেদ্য তাম্বূল দিবার পর পরাহিত বেদপাঠ করিতে করিতে কর্পূরালোকে আরতি হয়, পরে সেই আলোকে দেবদর্শন ও তাহার আঘ্রাণ লওয়া হয়।

যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রপুষ্পপাঠে পুষ্প প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে চারি আনা হইতে এক টাকা দক্ষিণা দিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। অর্চ্চকগণ বৈদিক-ব্রাহ্মণ, পালাক্রমে প্রত্যহ পূজা করিয়া থাকে। কোন সঙ্গতিপন্ন আগন্তুক দেবদর্শনে উপস্থিত হইলে অপর বৈদিক অর্চ্চকগণ সমবেত হইয়া পূর্ব্বোক্ত অভিষেক মন্ত্র ও মন্ত্রপুষ্প সমস্বরে গাহিয়া থাকে; প্রত্যেকে অর্দ্ধ আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত পাইলেই পরম আহ্লাদিত হন। বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা ও হরিদ্বারের ন্যায় পাণ্ডার ও অর্চ্চকগণের উৎপীড়ন এ প্রদেশে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি কেহ দেবদর্শন ও পূজা করিয়া আত্ম-সন্তোষ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাঁহাদের সকলকেই দক্ষিণদেশের তীর্থদর্শন করিতে অনুরোধ করি।

দ্বিতীয়াংশ সমাপ্ত।